জীবন প্রসঙ্গ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ডি, এম, লাইব্রেরী
কলিকাতা

ভূমিকা

"জীবন প্রসঙ্গের" প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ের রচনা। ইহার কোন কোনটি পুস্তিকাকারে কোনটি বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি বিশেষভাবে আলোচনামূলক প্রবন্ধ,—জীবনের ঘটনাবলীর সংগ্রহ নহে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ দুইটি প্রবন্ধ ঐ পুস্তিকাদ্বয়ের অংশ বিশেষ। বাঙ্গলার রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়ত কাহারও কাহারও ভাল লাগিতে পারে।

৩বি, সদানন্দ রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৪৮ সাল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবধাত্রী জগতকে আমরা প্রাচীনা পৃথিবী বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই পৃথিবী অতি নবীনা, জীবের জীবনলীলা এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই। তাহার মধ্যে আবার নবীনতম প্রাণী মানুষ সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন্য ও যাযাবর মানুষের জীবনে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা তো সেদিনের কথা। জীবসৃষ্টির বিকাশ ও বিবর্ত্তনের ছন্দের দিক হইতে দেখিলে ইহা অনু হইতেও অনুতর ;—আবার ইহার বিস্তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের দিক হইতে দেখিলে, ইহা মহৎ হইতেও মহত্তর।

মনুষ্যজাতির অতীত ইতিহাস আধুনিক মানবের বুদ্ধি কল্পনা, তথ্যানুসন্ধান ও নব নব সিদ্ধান্তে রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমরা মুগ্ধ হই, গর্ব্বিত হই। ইতিহাসের পারম্পর্য্যের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক সীমায় বিশেষ জাতির বিশেষ আদর্শ অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করি। ভাবি এবং ভাবিয়া আনন্দ পাই—এক একটা জাতি এক একটা পৃথক আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় ভরিয়া তুলিবার জন্য শতাব্দীর

পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে, করিতেছে। মানবেতর প্রাণীরা জলে স্থলে শূন্যে হিংসা ও হত্যায় পরস্পরকে উৎসাদন করিয়াও টিকিয়া আছে—সৃষ্টির এই রহস্যকে যেমন আমরা এক মহান বিধান বলিয়া মানি, তেমনি মানুষের পরস্পরকে হনন ও পীড়নেরও একটা মঙ্গলময় পরিণাম আমরা কল্পনা করি, প্রমাণ করি সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তারের জন্য ইহার আবশ্যক ছিল।

হিংসা হত্যা লুণ্ঠন পীড়ন বন্ধন বেদনার মধ্যে, নিষ্ঠুর পাশবিক লোভ ও ক্রুর নির্ম্মমতার মধ্যে মুষ্টিমেয় মানুষের দাসত্ব করিয়া অধিকাংশ মানুষ বংশানুক্রমে কি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে বর্ত্তমানকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার জৈব বর্ব্বরতা ইতিহাসের রচনা-নৈপুণ্যে আবৃত। ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মযাজকগণ অতীতকালকে 'সত্যযুগ' বা 'গোল্ডেন এজ' বলেন ; তাঁহাদের মতে মানুষ নীতি-ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ পাইতেছে। সাধারণ মানুষ তাঁহাদের নির্দ্দেশিত নীতি-ধর্ম্ম পালন করে না, পালন করিবার ভান করে এবং ভাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই শোক-দুঃখহীন প্রাচুর্য্য-ভরা জীবন একদিন দয়ালু ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ফিরাইয়া দিবেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উদ্দাম কল্পনা এবং ধর্ম্মব্যবসায়ীদের ফাঁকীবাজীর মধ্যেও আধুনিক যুগের কিছু মানুষ এইটুকু বুঝিয়াছে,—সত্যযুগের কোন অস্তিত্ব এই ধরণীতে কোনকালে ছিল না। মানুষ যখন গিরিগুহায়,

বৃহৎ বনস্পতির শাখায় অথবা খরস্রোতা নদীর তীরে তীরে বাস করিত, তখন সহস্র সহস্র বৎসর সাধারণ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা তাহার জীবনযাত্রায় বিশেষ কোন বৈচিত্র্য ছিল না। আত্মরক্ষার হিংস্র সতর্কতায় সে ছিল নিষ্ঠুর, অপরকে হত্যা করিয়া আমমাংস ভোজনেও তাহার অরুচি ছিল না। অজ্ঞতা, হিংসা ও দ্বেষের সেই অদৃশ্য শক্তি এখনও মানুষের জীবনযাত্রা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। পশুচারণ, কৃষি ও কুটির শিল্প লইয়া আদিম মানবের দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসী প্রকৃতি যেদিন সভ্যতার প্রথম বনিয়াদ পত্তন করিল, সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও মুষ্টিমেয় মানুষ চিরদিনই অজ্ঞ, মূঢ় জনসমষ্টিকে শাসন ও শোষণ করিয়াছে। বিবর্ত্তনের মুখে মানুষের জ্ঞান বাড়িয়াছে, নূতন নূতন শক্তি করায়ত্ত হইয়াছে, প্রকৃতি অধিকতর বশে আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শোষণ ও পীড়ন-নৈপুণ্য বাড়িয়াছে। যে ছিল দলপতি, সে হইয়াছে সম্রাট ; যে ছিল সম্রাট—সে হইয়াছে ডিক্টেটর। প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ডিক্টেটরতন্ত্র সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রের পশ্চাতে নেপথ্যে থাকিয়া কার্য্যতঃ সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালন করিতেছে,—নবযুগের নূতন সৃষ্টি মুনাফা-শিকারী ক্যাপিটালিষ্ট বা পুঁজিপতি!

এই ধারার একটা প্রতিকূল ধারাও সভ্যতার প্রথম প্রত্যূষ হইতে ইতিহাসে প্রকট হইয়াছে। এই শক্তির ঘাত প্রতিঘাতেই সভ্যতার সৃষ্টি। এই শক্তি চাহিয়াছে, মানুষের

দুঃখ নিবৃত্তি ও মুক্তি। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির কত অস্পষ্ট ধারণা কত দুঃসাধ্য উদ্যম হইতে কত ধর্ম্মমত, কত দর্শন উদ্ভূত হইয়াছে। সমস্যার সমাধান ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া বিরক্ত ও ব্যথিত মানুষ সমস্ত সৃষ্টিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে; কখনও বা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা খুঁজিয়া না পাইয়া মানুষ একজন খেয়ালী ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের লীলা বা অভিপ্রায়ের মধ্যে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিয়াছে। একদিকে মানুষের দুঃসাহস ও বাহুবল ভোগৈকলক্ষ্য হইয়া মনুষ্য-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, অন্যদিকে মানুষের মণীষা, তিতিক্ষা ও প্রেম মনোরাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ধর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণের জীবন ও চিন্তারাশির মধ্যেই আমরা মানব সভ্যতার বিকাশের স্তরগুলির সন্ধান পাই। আরও দেখিতে পাই, ভারতের বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, স্মৃতি ও ব্যবহার-শাস্ত্র, মহাচীনের দার্শনিক পথ, গ্রীক্ দর্শন ও রাজনীতি, রোমক নীতি ও লোক ব্যবহার এবং এই সকল প্রাচীন জাতির পুরাণ কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতির মিলিত মিশ্রিত আদর্শ ও ভাবই নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া অদ্যকার মনুষ্য সমাজ ও মানবের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ এই প্রচলিত চিন্তাধারার উপর এক অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব আনিয়াছে সত্য—কিন্তু পুরাতন

জ্ঞানবিদ্যার গোঁড়ামির ফলে চিরাচরিত উপায়ে আধুনিক মানুষ এই নূতন শক্তিকে আজিও সর্ব্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারে নাই।

এই বিপুল পৃথিবীর বহুধা বিভক্ত মানব-সমাজ বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে কত সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কয়জন—কয়জন মানুষকে অদ্যকার মানুষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। অজস্র মানবজীবন বুদ্বুদের মত উঠিয়া তরঙ্গায়িত প্রাণ-সমুদ্রে মিলাইয়া গিয়াছে—যে কয়জনের চিন্তা ও চরিত্রের স্মৃতি মানুষ রক্ষা করিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। আবার যাহারা ধন চাহে নাই, ভোগ চাহে নাই, যশ চাহে নাই, লোকলোচনের নেপথ্যে মানব কল্যাণে তিলে তিলে আত্মদান করিয়া গিয়াছে, তাহাদের কয়জনের নাম ও স্মৃতি ইতিহাস ধরিয়া রাখিয়াছে। মানব সমাজ এখনও শিশুর মত অজ্ঞ অসহায় ও মূঢ়; পশুর মত হিংস্র ক্রূর সন্দেহাতুর; তাই যখন একজন সত্যিকার মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাকে মানুষ অবতার বলিয়াছে, ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়াছে, নরদেব মহাপুরুষ বলিয়াছে, তাঁহাদের আশ্চর্য্য জীবন ও অভিনব উপদেশ শুনিয়া অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়াছে, কিম্বা ভীত হইয়া তাঁহাদের হত্যা করিয়াছে। আদিম মানব প্রাকৃতিক নিয়মের আকস্মিক ব্যতিক্রম, যথা—সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জলোচ্ছ্বাস, ভূ-কম্প প্রভৃতি দেখিয়া

যেমন ভয়ে বিহ্বল হইত, তেমনি ঐ সকল মানুষকে কেহ বা শয়তান মনে করিয়াছে, কেহ বা দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে। সমষ্টিগত ভাবে নূতন ভাব নূতন আদর্শ সেকালের মানুষ গ্রহণ করিত না, একালের মানুষও গ্রহণ করে না। মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের মতামত ও আচরণই মানুষ সহজ ভাবে গ্রহণ করে এবং নির্ব্বিচারে পালন করিয়া যায়। মানুষের চিন্তাপ্রণালী, মানসিক গঠনের অন্ততঃ গত দুই তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বুদ্ধের যুগের মানুষ আর বিবেকানন্দের যুগের মানুষ বুদ্ধি ও ভাবাবেগের দিক দিয়া একই, অতীত যুগগুলিতে যেমন, বর্ত্তমান যুগেও তেমনি অতি অল্প সংখ্যক মানুষই প্রচলিত সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এই অল্প সংখ্যক মানুষের চেষ্টাতেই যাহা কিছু পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, একটি কৃষ্ণ, একটি বুদ্ধ অনেকদিন পর পর হইয়াছে, এমন দিন আসিবে যখন কালো-জামের গুচ্ছে গুচ্ছে কৃষ্ণ ফলিবে। বিবেকানন্দ বলিতেন, জলপাত্র অগ্নিতে বসাইলে প্রথমে দু'একটা ফুট ওঠে, ক্রমে সমস্ত জলই টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে। তেমনি রামকৃষ্ণ একটা ফুট। মানব সভ্যতার শৈশবের খেলা চলিয়াছে মাত্র—এখনও মানুষ যৌবনে পদার্পণ করে নাই। কিন্তু মানবের ঘরে জ্ঞানে কর্ম্মে বলিষ্ঠ যুবক মানুষ প্রত্যেক

দেশেই ছু' দশজন আসিয়াছেন এবং আসিতেছেন। তাহা দেখিয়াই প্রত্যয় হয়, এই শিশু মানব সমাজ একদিন যৌবনে উত্তীর্ণ হইবে। বাঙ্গলাদেশে বিবেকানন্দ তাহারই আভাষ। মানুষের জীবনস্রোতে এই মহাতরঙ্গ উঠিয়া একদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূ-খণ্ডে আঘাত করিয়াছিল। সর্ব্বমানবের প্রতি প্রেম ও সেবার পতাকা ছিল তাঁহার দক্ষিণ-মুষ্টিতে, কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছিল—সমষ্টি-মুক্তির মহাবাণী। সে মুক্তি পারলৌকিক নহে, একান্ত ইহলোকের। "যে ভগবান ইহলোকে এক টুকরা রুটি দিতে পারে না; সে পরলোকে স্বর্গসুখ দিবে, এমন ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না"

আজ তাঁহার একোণ-অশীতিতম জন্মতিথি। প্রায় উনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম্মসভায় তিনি জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে সর্ব্বমানবের ঐক্য ও সাম্যের যে ভেরীধ্বনি করিয়াছিলেন—দশ বৎসর কাল সমগ্র জগতে ও বিশেষ ভাবে ভারতে তাহা প্রচার করিয়া, স্বয়ং আচরণ করিয়া ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড় মঠ মন্দিরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার পরিত্যক্ত ও অসমাপ্ত কার্য্য দীর্ঘকালের মধ্যে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, কতটুকু সফল ও ব্যর্থ হইয়াছে—আজ তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিবার দিন। বিবেকানন্দ সমগ্র মানব জাতির সম্পদ হইলেও, যে দেশে যে জাতির মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাহাদের অধঃপতন, যুগোপোযোগী সংস্কার গ্রহণের অক্ষমতা, আড়ষ্ট জীবনের গ্লানি বিশেষভাবে অনুভব করিয়া প্রতিকারো পায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং ছত্রভঙ্গ সমাজজীবন পুনর্গঠনের জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন, উৎসর্গীকৃতজীবন কর্ম্মী!

জীবনের সূর্য্য আজ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তথাপি সমস্ত পরিবর্ত্তন, শোক তাপ দোষ ত্রুটির মধ্যেও কৈশোরের স্বপ্ন অম্লান রহিয়াছে। যাহা ছিল স্বপ্ন ক্রমে তাহা বাস্তবে পরিস্ফুট হইতেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রেই হউক, আর সামাজিক ক্ষেত্রেই হউক,—বিবেকানন্দের নাম লইয়াই হউক, আর নাই হউক, পীড়িত মানবের বেদনায় হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে সমষ্টি-মুক্তির সাধকগণ ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। প্রেম, পরিবার, স্বজন, নিরাপদ গৃহকোণ, অর্থ উপার্জ্জন দুপায়ে দলিয়া মানব মুক্তির পতাকাবাহীরা আজ সমস্ত দুঃখ এমন কি মৃত্যুভয়হীন হইয়াও কার্য্য করিতেছেন। ইঁহারা না থাকিলে কাহাদের মুখ চাহিয়া বাঁচিতাম! এই হতশ্রী বিগত ভাগ্য পরাধীন নিরন্ন শত রোগ মহামারীর দেশে সহজেই নৈরাশ্য আসে, সুনিশ্চিত কল্যাণের উপর বিশ্বাস রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। কেন না পরাধীনের পরমুখাপেক্ষিতায় জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া গিয়াছে। ভীরুতা ও ভণ্ডামির তামসিক অভিনয়ে তিক্ত, সাবধানী বিষয়ীর বিষ নিঃশ্বাসে জর্জ্জরিত, ধনী মানীদের দ্বারা উপেক্ষিত, চতুর ব্যবসায়ীর

শাস্তি-শঙ্কা-হীন পাটোয়ারী বুদ্ধির চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াও যাঁহারা সমস্ত অসম্মান অবজ্ঞা বন্ধন লাঞ্ছনা বঞ্চনা ও বিদ্রূপ, উপেক্ষা ও ক্ষমা করিয়া আদর্শের পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া আছেন,—তাঁহাদের তাপদগ্ধ তাম্র ললাটের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া প্রতিদিন বিবেকানন্দকে বন্দনা করি। এই মহান যুগে জন্মিয়াছি বলিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হই। জানি পরাধীন জাতির জীবনে অপচয় ও ক্ষতি প্রচুর। এই বৃহৎ পট ভূমিকায় ব্যক্তির দুঃখ কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ। পীড়িত ও বঞ্চিত হইয়া কেন করিব অভিমান, কেন দিব অভিশাপ?

দানবীয় লোভের সহিত মুক্তিকামী মানবের সংগ্রাম নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে,—দেশে দেশে কি বীভৎস বিভীষিকা! এই প্রলয় পয়োধি হইতে মনুষ্যত্ব ও মানব সমাজকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের তাঁহাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্যেই আমরা বিবেকানন্দের জীবন-স্বপ্নের সাফল্য দেখিতেছি এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—হে নব্যভারতের মন্ত্রগুরু! মানব সমাজ শৈশব খেলা শেষ করিয়া উন্নত স্তরে উঠিবার জন্য জীবন মরণ সংঘর্ষে রত হইয়াছে। সঙ্কটের দিনে আমাদের তুচ্ছ জীবনের শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও যেন সেই সংগ্রামে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে পারি। তোমার সেই মহাবাণী যেন কোন লোভে ভয়ে মোহে দুর্ব্বল হইয়া বিস্মৃত না হই—"সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু।"

স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী জন্মে। মানুষ কদাচিৎ কখনো জন্মে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বাঙ্গলা দেশে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতিথি। বাঙ্গালীর আজ এক স্মরণীয় দিন। এইদিনে বাঙ্গালী একজন মানুষ হারাইয়াছে। সেই মনুষ্যটিকে বোধ হয় আর এক শতাব্দীর মধ্যে বিশ্ববিধাতার নিকট ভিক্ষা চাহিলেও পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এক শতাব্দীর মধ্যে একটা জাতি যাঁহার অভ্যুদয় মাত্র একবার দর্শন করিতে পারে, তাঁহার মৃত্যু-তিথিতে বাঙ্গালী হইলেও তাহারা সেই মহাপুরুষকে অন্ততঃ একবার স্মরণ করিবে।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব কে ছিলেন, কি ছিলেন, অধিকাংশ বাঙ্গালী-প্রধানেরাই তাহা জানেন না। প্রতিদিন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করেন না। আমাদের দেশে তো নহেই। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য সে জাতির যে শতাব্দীতে একজন করিয়া জন্মে যে মানুষ, তাহার জীবন হইতে শক্তিগ্রহণে অসমর্থ হয়। ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পর তাঁহার অতি অদ্ভুত জীবন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন আলোচনাই হয় নাই। তাহার কারণ বাঙ্গলা দেশে জীবন নাই। কাজেই এদেশে জীবনচরিত লইয়া কোনপ্রকার

আলোচনা হয় না। কিন্তু যে জীবন দিয়াছে, উচিত তাহারই জীবন লইয়া আলোচনা করা, যেমন যে কবিতা দিয়াছে, উচিত তাহার কাব্য লইয়া আলোচনা করা।

ব্রহ্মবান্ধব কি ছিলেন? উত্তরে কেহ যদি বলে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা হইলে সে কথা মৃত্যুর পরও তাঁহার যজ্ঞোপবীতধারী মৃতদেহ সাক্ষ্য দিবে, যেমন একদিন রাজা রামমোহনের মৃতদেহ সুদূর প্রবাসে মৃত্যুর পরও ব্রাহ্মণত্বের সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছিল। কোন শক্তিশালী পুরুষই এই বিশ্ব সংসারে আত্মপরিচয়ের জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না। ব্রহ্মবান্ধবও তাহা করেন নাই। এবং যে শ্রেণীর জীবনচরিত লেখকেরা উপাধ্যায়ের মত জীবন লইয়া জাতির সম্মুখে সঙ্গতরূপে আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন, বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান সাহিত্যে তাঁহাদের কোন একটিরও পরিচয় আমরা পাই না। যে অদ্ভুত, জটিল ও কঠোর জীবন ইনি বিলাসী আয়েসী একটা অত্যন্ত অপদার্থ জাতির সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সাধ্য নাই, স্পর্দ্ধা নাই, কেহ সেই জীবনের উপর হইতে এতটুকু মাত্রও মৃত্যুর যবনিকা উন্মোচন করে।

কেহ বলিবেন—না ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। খৃষ্টানের মধ্যেও রোমান-ক্যাথলিকেরা বলিবেন, তিনি আমাদের ছিলেন। প্রটেষ্ট্যান্টরাও তাঁহাদের দাবী সহজে ছাড়িবেন না। ব্রাহ্মগণ বলিবেন, তিনি প্রথম জীবনে তো

ব্রাহ্মই ছিলেন ; অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহাকে প্রথম আলোক প্রদান করিয়াছে। তাহা করুক, আমাদের আপত্তি নাই। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রজ্বলিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকে যে এবং যাহার ইচ্ছা আলোক দান করুক। বৈদান্তিক বন্ধুরা বলিবেন, তিনি বেদান্তবাদী ছিলেন। আবার বৈদান্তিকদিগের মধ্যেও অদ্বৈতবাদীরা বলিবেন, তিনি আমাদেরই ছিলেন। অথচ মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বৈদান্তিক বক্তৃতাগুলি বাঙ্গলাদেশে কেহ কখনো অন্বেষণ করিয়া দেখিবার ক্লেশ স্বীকার করেন নাই। মার্টিনো, হেগেল অথবা হেগেল-শিষ্য কেয়ার্ড কিম্বা গ্রীন ব্রহ্মবান্ধবের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। চর্ব্বিত-চর্ব্বণ-বিলাসী, উচ্ছিষ্টভোজী অস্মদ্দেশের উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের বেদান্তব্যাখ্যা ইয়োরোপের এই সমস্ত মহামনীষীর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বাতন্ত্র্য মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মবান্ধব, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয়, শুধু ব্রাহ্মণ ছিলেন না, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ ছিলেন। খৃষ্টানের মধ্যেও তিনি স্বীয় ধর্ম্মজীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এমনভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন যে, একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক মহাশয় পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে,—"Even I misunderstood him—(Upadhaya)" অর্থাৎ, এমন কি আমি পর্য্যন্ত উপাধ্যায়কে ভুল বুঝিয়াছিলাম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধ্যায়ের এক বেদান্তের বক্তৃতা শুনিয়া

ফাদার জোসেফ্ রিকাবী তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—"I have heard him (Upadhaya) much spoken against, he made a good impression on me." অর্থাৎ উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক লোকের নিকট আমি অনেক কথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এখন আমার অত্যন্ত উচ্চধারণা জন্মিয়াছে। স্বদেশ এবং বিদেশের খৃষ্টান পাদ্রিগণ—যে অংশে ব্রহ্মবান্ধব খৃষ্টান ছিলেন, সেই অংশকে আলোচনা করিতে গিয়া কতবার কতস্থানে দুরূহ জটিল সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন এবং সে কথা তাঁহারা স্বীকার করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন নাই। আর আমরা হিন্দু, আমরা বাঙ্গালী, আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা বৈদান্তিক, আমরা গৈরিক আচ্ছাদিত দেহ নবযুগের সন্ন্যাসী এতবড় একটা শক্তিশালী বৃহৎ ও মহৎ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অত্যন্ত নির্ব্বিকারচিত্তে বসিয়া ধূমপান ও তাম্বুলচর্ব্বণ করিতেছি।

ব্রহ্মবান্ধব প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন। পরে সিন্ধুদেশে গমন করিয়া প্রটেষ্ট্যাণ্ট মতে দীক্ষিত হইয়া গীর্জ্জায় যাইতে অস্বীকার করিয়া পুনরায় করাচীতে গিয়া রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হইয়া, শেষে বেদান্তের মত অবলম্বন করিয়া, বেদান্তের সহিত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া—নিজেকে বেদান্ত মতাবলম্বী ক্যাথলিক (Vedantic Catholic) বলিয়া প্রচার করিয়া, ইংলণ্ড, ইতালী প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে

গমন হেতু ব্রাহ্মণ্যের দোহাই দিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বার্দ্ধক্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। যে জীবন সত্যের অনুসন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে, ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রখর প্রচণ্ড সন্ন্যাসের মহাবীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া আকাশের বজ্রের মত হুহুঙ্কারে পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে, বড় দুর্ভাগ্য সে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল। পরনিন্দা, পরচর্চ্চারত শ্লথ-শিথিল লেখনী ধারণ করিয়া কেহ যেন এই জীবন আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা না করে। আজীবন কঠোর সন্ন্যাস লইয়া এই মহাত্যাগী ব্রাহ্মণ একদিন জীবন-সায়াহ্নে স্বদেশ-প্রেমিকদের দলে মিশিয়া ভাঁড় সাজিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য তাঁহাদের যাঁহারা আজ দেশের দুর্গতি পণ্যদ্রব্যের মত লইয়া ব্যবসায় করিতেছেন, মৃত্যু-পণ স্বাধীনতা বাক্‌চাতুরী দ্বারা লভ্য মনে করিয়া দেশকে প্রতারিত করিতেছেন। আজ তাঁহাদের এই সিংহের তিরোভাব আলোচনা করিবার অবসর নাই। ইন্দুর এবং বিড়াল বিশেষতঃ কাঠবিড়ালীর ঠক্‌ঠকানী বাঙ্গলাদেশে কিঞ্চিৎ অধিক শোনা যাইতেছে। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র বহু দিন মরিয়া গিয়াছেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে সক্ষম হইয়াছি এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাঙ্গোপাঙ্গগণ অপ্রমত্তচিত্তে অত্যন্ত নিরানন্দে কালযাপন করিতেছেন। নতুবা এই অদ্বৈতবেদান্তবাদী আকুমার

ব্রহ্মচারী, কঠোর তপস্বী, স্বদেশী আন্দোলনের রাষ্ট্রক্ষেত্রে রুদ্ররূপে জাগ্রত সন্ন্যাসী উপাধ্যায়ের জন্য সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য বাঙ্গলার কোন আশ্রমেই তো কোন চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে না। শোনা যায়, বাঙ্গলাদেশে শুধু গৃহস্থ নয়, সন্ন্যাসীও আছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব গৃহী ছিলেন না, সন্ন্যাসী ছিলেন। আদর্শ সন্ন্যাসী ছিলেন। .এই আদর্শ সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ও বিশিষ্ট স্বাদেশিকতার রূপ বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় সাধকগণের ধ্যানে কিছুতেই ধরা দিল না।

পাশ্চাত্য বিলাসের মোহ কাটাইয়া ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সমস্ত দিকে বঞ্চিত রাখিয়া বাঙ্গলার নবযুগের এই আদর্শ সন্ন্যাসী নিজের স্বাধীন চিন্তাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রমকে সম্পূর্ণরূপে মর্য্যাদা দিয়া—সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, দর্শন বহু বিষয়ে বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। এবং আমরা সেই চিন্তার অংশ অদ্যাপি গ্রহণ দূরের কথা—অন্বেষণ করিবার ক্লেশও স্বীকার করিতেছি না।

তিনি সন্ন্যাসী এবং অদ্বৈতবেদান্তবাদী হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হইতে পৃথক, খৃষ্টভক্ত হইয়াও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে পৃথক; রাষ্ট্রের সংস্কারে উদ্যত হইয়া সেই স্বদেশী দিনের, অদ্যকার মিনিষ্টর সুরেন্দ্রনাথ হইতে পৃথক এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক।

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল।

স্বামী সারদানন্দ

পারমার্থিকতাভ্রষ্ট একটা পতিত জাতির মৃত ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা সভ্যতার শবের উপর বসিয়া সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল নিরলস নিষ্ঠার সাধনা করিয়াছেন যে মহাভৈরব, অল্পদিন হইল তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। এই পুণ্যধর্ম্ম-ভূয়িষ্ঠ দ্বিষষ্ঠীবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া মনুষ্যত্বের সু-মহৎ গৌরব দর্শন করিয়া ধন্য হৌক।

এই শক্তিশালী জীবন নবজীবনে তৃষ্ণার্ত্ত চিত্ত লইয়া পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশে কি ভাবে দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছিলেন সে কাহিনী অনেকেই জানেন। দশজন কলেজের ছাত্র যে পথে চলিয়া যে অভীষ্ট লাভ করে, সে পথ তাহার চলিবার পথ নয়—ইহা যেদিন তিনি অনুভব করিলেন, সেইদিনই অবলীলাক্রমে জন্মগত জাতিগত সংস্কারের বাধা ছিন্ন করিয়া একেবারেই মুক্ত আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তেজোময় ঋজুস্বভাব এই বলিষ্ঠ পুরুষ দক্ষিণে ও বামে চাহিলেন না—একাগ্র লক্ষ্যে ভারতবর্ষের পরম সাধনায় ডুবিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধি ও সাধনা তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছিল; কাজেই বাঙ্গালী সমাজের অত্যন্ত গতানুগতিকতা হইতে

নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে তাঁহাকে অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয় নাই।

তরুণ বয়সেই সত্যলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া সত্য দীক্ষা লাভ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিলেন—এই বালকের মধ্যে ত্যাগের জ্বলন্ত শক্তি রহিয়াছে। একদিন শরচ্চন্দ্রকে ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কি ভাবে ঈশ্বর প্রণিধান করিতে চাহ? ধ্যানে কোন্ রূপ দেখিতে তোমার ইচ্ছা!

শরচ্চন্দ্র উত্তর করিলেন,—আমি ধ্যানে ঈশ্বরের কোনও বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি না। আমি তাঁহাকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত দেখিতে চাহি। অলৌকিক দর্শন আমার অভিপ্রায় নহে।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—এ যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ কথা। এতো একদিনের কাজ নহে।

যুবক ধীর স্বরে উত্তর দিলেন,—ইহার কমে আমার শান্তি হইবে না। যতদিন ঈপ্সিত লাভ না হয়, ততদিন আমি সাধনায় বিরত হইব না।

শরচ্চন্দ্রের মানসিক অপরিমেয় বলের চিত্রটী এই কথোপকথনের মধ্য দিয়া কি পরিপূর্ণ রূপেই না প্রকাশিত হইয়াছে! সর্ব্বসাধনায় সিদ্ধ জগৎগুরুর নিকট তিনি কিছু

চাহিলেন না, প্রাকৃতজনের ন্যায় অলৌকিক দৃশ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না, তিনি ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম সাধনার চরম লক্ষ্যের উপর ধ্রুব দৃষ্টি রাখিয়া অনায়াসে বলিলেন,—গুরুদেব, আমি সাধনা দ্বারাই সত্য লাভ করিব। এইখানেই বল, এইখানেই তেজ, এইখানেই শক্তি, এইখানেই মনুষ্যত্বের গৌরব। যাহা দুঃখের ধন, তাহা ভিক্ষা করিয়া লইব না; দুঃখ করিয়া পাইব—এই তো মানুষের তীব্র আত্মমর্য্যাদাবোধ।

যে সমস্ত মুমুক্ষু যুবক এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সমবেত হইতেন, শরচ্চন্দ্র অল্পদিনেই তাঁহাদের সশ্রদ্ধ ভালবাসা লাভ করিলেন—ধীর গম্ভীর উদার স্বল্পভাষী অথচ কোমলহৃদয় যুবক স্বীয় চরিত্র-মাহাত্ম্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে স্বীয় বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন ভক্তগণের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, তখন মুষ্টিমেয় ত্যাগী যুবক বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সংসার ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন—জগতের কল্যাণের জন্য, স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, ধর্ম্মের বিকৃতি, সামাজিক জীবনের অধঃপতন দূর করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহান আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার সাধন ও প্রচার করিবেন—এই ইচ্ছা। গুরু বিয়োগ ব্যথায় দুঃখভার-নম্র মহামৌনী সাধক শরচ্চন্দ্রকেও আমরা সেদিন বরাহনগরের

ভগ্নবাটীতে গুরুভ্রাতাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহোচ্চ সাধনায় ব্রতী দেখিতে পাই। মহৎ আদর্শের জন্য গুরুগত প্রাণ বাল-সন্ন্যাসীদের এই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন যখন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল—তখন প্রতিপদে তাঁহারা বাধা পাইতে লাগিলেন। তৎকালীন সমাজের প্রতিকূলতা, আত্মীয় স্বজনের বাধা, দারিদ্র্যের পেষণ এ সকলই পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। শরচ্চন্দ্র ঋজু একাগ্রতা লইয়া মানবসাধ্য সকল কৃচ্ছ্র ব্রতই স্বীকার করিলেন। ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিত্তি বরানগরের জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনের নিভৃত কক্ষে স্থাপিত হইল। তারপর দেখিতে পাই—তাপস শরচ্চন্দ্র পরিব্রাজক সন্ন্যাসী-রূপে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন, কখনো বা হিমালয়ের শান্ত গম্ভীর ক্রোড়ে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন—বিশ্বমানবের সেবা ব্রতে নিজেকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। অমৃতের সাধনায় দিব্যভাবে বিভোর সাধক কি ব্যাকুলতা লইয়া ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন কে বলিবে? যে জাতির সামাজিক জীবনের উপর জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহাকে অতীত মহত্ত্ব-সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার সত্য পরিচয় লাভের জন্যই বোধহয় এই পরিব্রাজক ব্রত, এই তপশ্চর্য্যা!

এই কালের পূর্ণতায় একদিন সুদূর আমেরিকার বিশ্বধর্ম্ম-সভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে

আত্মপ্রকাশ করিলেন,—প্রচারশীল হিন্দুধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তখন গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বামী সারদানন্দ বেদান্তের পতাকাহস্তে পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামী সারদানন্দ গুরুভ্রাতাগণের আগ্রহাতিশয্যে এই নবীন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকত্বের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-জীবনাদর্শে এই যে নূতন ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইল—ইহা কোনও নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিল না, অথচ বর্ত্তমান ধর্ম্মসাধনার বিকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। ইহাতে লোকাচারপন্থী প্রাচীনের দল চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাঙ্গালী সমাজের কৃশ জীর্ণ দৌর্ব্বল্য, নবযুগের নূতন সন্ন্যাসের মহাবীর্য্যকে আপন শক্তিরই প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিল না। মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে নূতন আদর্শ, নূতন ভাব কোনদিনই সমাজে বিনা বাধায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। অতএব এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কিন্তু সত্যের জন্য সকল বাধা বিপত্তি, সকল অসম্মান যাঁহারা হাস্যমুখে বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিজের বলিতে কিছুই রাখেন নাই—আরাম না—বিশ্রাম না—ভয় না—সঙ্কোচ না—তাঁহাদের কেবল এই পণ ছিল, দেশের সম্মুখে খাঁটী জাতীয় আদর্শ স্থাপন করিবেন।

দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীবৃন্দের ভাবের গভীরতা এবং উদ্দেশ্যের একতা সমস্ত বৃহৎ বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিল, এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রত্যাশিত তিরোভাবেও সঙ্ঘের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার কোন বাধা ঘটিল না। “সঙ্ঘের কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টি প্রয়োজন” তাহা স্বামী সারদানন্দের ছিল, এবং তাহা ছিল বলিয়াই কোন দিন তাঁহার নৈরাশ্য আসে নাই।

বাহিরে লোকসমাজে যশঃ প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার প্রচুর ছিল, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাবের পর তিনি নিজেকে বাহিরের সকল কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্তভাবে সঙ্ঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আত্মগোপনকারী এমন নিরলস কর্ম্মী কদাচিৎ দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করা যায়।

গত সতর বৎসরকাল তাঁহাকে দেখিয়াছি। যে কর্ম্ম, প্রচুর উদ্যমের সহিত নিজেকে বিস্তীর্ণভাবে প্রকাশ করে, তাহা তাঁহাতে ছিল না, কেননা কর্ম্মকে অনর্থক বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে অতিরিক্ত আড়ম্বরের আবশ্যক, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ক্ষুদ্র বলিয়া কোন কর্ম্মই তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল না, কেননা ছোট বড় সকল কাজের মধ্যেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি সহজ নৈপুণ্যে প্রয়োগ করিতেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অতি ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক বিস্তৃতির মুখেই তিনি অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়াছেন। বিস্তারের ফলে ত্যাগের ভাব ও আদর্শানুরাগ পাছে হ্রাস পায়, এই আশঙ্কা তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল। যেখানে বিশ্বাস কম, সেইখানেই প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ আয়তনের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিবার স্পৃহা জাগে। সত্যবস্তুকে ফেণায়িত করিয়া আকারে বৃহৎ করিয়া দেখাইবার লেশমাত্র চেষ্টা তাঁহার মধ্যে দেখি নাই। সত্যকে তিনি খাঁটীভাবেই বিনা আবরণে প্রকাশ করিতেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির মূল রহস্য ইহাই।

বাগবাজারের ক্ষুদ্র বাটীতে শ্রীশ্রীমার পদপ্রান্তে বসিয়া এই আত্মসমাহিত জ্ঞানযোগী তাঁহার জীবন দেশের সকল মঙ্গল চেষ্টায় তিলে তিলে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। একতলার ছোট্ট ঘরখানিতে এই মহাপুরুষের আত্মমগ্ন 'নিবাতনিস্কম্পমিব প্রদীপম' জ্ঞান গম্ভীর রূপ কতবার না দেখিয়াছি,—প্রকাণ্ড ধরণী প্রচণ্ডবলে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান হইয়াও যেমন স্থিরবৎ প্রতীয়মান হয়, এই মহাকর্ম্মীও ঠিক তেমনি আপনাতে আপনি অটল থাকিয়া প্রতিভাত হইতেন। আমাদের স্থূল দৃষ্টির সাধ্য কি যে, সে মহৎ জীবনের যবনিকার একপ্রান্ত তুলিয়া দেখিতে পারে। তথাপি তাঁহার আত্মসম্বরণ করিবার, আত্মগোপন করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল বলিয়া—সর্ব্বদাই তাঁহাকে একান্ত আপনার ভাবে অতি নিকটে পাইতাম।

ধর্ম্মকথা, অধ্যাত্ম উপদেশ, কূট তর্ক, সাংসারিক পরামর্শে কত লোক কতভাবে সময়ে অসময়ে তাঁহাকে অনর্থক উত্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও বিরক্ত হইতেন না, রুষ্ট হইতেন না, ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলকে সমানভাবে সমাদর করিতেন, সকলের কথা সমান শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। মানুষের আত্মার চিণ্ময়রূপ যিনি দেখিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার উদার স্বার্থলেশহীন প্রেম দ্বারা তিনি সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর্য্যাপ্ত বল-বুদ্ধি দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও এমন প্রবল এমন সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে নারীমাত্রকেই মাতৃরূপে দেখিবার উপদেশ দিতেন। শ্রীগুরুর পুণ্য আদর্শের অনুসরনে সারদানন্দ মাতৃভাব সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-জননী সারদা দেবী তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, দয়া, মমতা লইয়া মাতৃত্বের যে অনুপম আদর্শরূপে বিরাজমানা ছিলেন, তাহাই ছিল সারদানন্দের শক্তি সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক। যে ভারতের আর্য্য-গৌরব ঋষিকুল নারী মহিমা প্রথম অনুভব ও প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ভারতে নারীজাতির প্রতি কাপুরুষগণের অবজ্ঞা ও অসম্মান দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ করুণা বিগলিত হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতেন। "যাহাদের করুণাপাঙ্গে তিনি জগতের যাবতীয় নারী মূর্ত্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ

শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন”—সেই ভারত নারীকূলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা যে কত সত্য পদার্থ ছিল, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। তাঁহার মধ্যে লেশমাত্র ভাবুকতার স্বপ্নাবরণ ছিল না। নারীর সমস্ত দৈন্য অপূর্ণতা ক্রটীর মধ্যেও তিনি জগদম্বার স্বরূপ দর্শন করিতেন। আমাদের দেশে কাপুরুষগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত অবমানিত নারীর বেদনা সম্পর্কে তাঁহার বোধ এত তীব্র ছিল যে—সেই বহুকাল সঞ্চিত অপরাধ সমষ্টির প্রায়শ্চিত্ত ব্রতই যেন তাঁহার সর্ব্বোচ্চ সাধনা—অতি দীনা নারীর প্রতিও অকুণ্ঠিত করুণার মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইত। নারীর দৈন্য তাঁহার শ্রদ্ধাই উদ্বোধিত করিত, অবজ্ঞা নহে। সমাজে নারীর প্রতি প্রতিদিনের অবজ্ঞা দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন, “অস্বাভাবিক শিক্ষা সম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্ব্বর! তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই হইয়াছে! একবার বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্জন নয়ন হইতে অপসৃত করিয়া ভূ-জগতে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের আদর্শ স্থানীয়া দিব্য নারীকূল একমাত্র ভারতেই হিমাচল স্তরের ন্যায় অনুলজ্ঘ্যনীয় শ্রেণীতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মানা। তাহাদের পদরজে কেবল ভারত নহে, পরন্তু সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমগ্র পৃথিবীই সর্ব্বকালের জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন। ভারতের ধূলি * * * সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধৈকপ্রাণা যশোধরা, চৈতন্যঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া,

ধর্ম্মপ্রাণা অহল্যা বাঈ বা চিতোরের বীর রমণীকূলের দেবারাধ্য পদস্পর্শে পবিত্রিত ! ভাব দেখি—ভারতের বায়ু যাহা প্রতি নিশ্বাসে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা ঐ সকল দেবীদিগের পবিত্র নিশ্বাসে ওতঃপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দেখিবে তোমার জগন্মাতা নারীকূলের উপর বিশেষতঃ ভারতের রমণীকূলের উপর হৃদয়ের ভক্তি প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমার কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমায় পরিণত করিবে।”

ভারতের শক্তিপূজার তত্ত্ব কহিতে গিয়া তাঁহার এই আবেদন অদ্যকার যুবক বাঙ্গলার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে কিনা বলিতে পারি না; তবে নারীজাতির প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার বলিষ্ঠ পৌরুষের জীবন্তমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ধন্য হইলাম।

কর্ম্মশালার সিংহদ্বার দিয়া যে জীবন, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সগৌরবে বিরামশালায় চলিয়া গেল—তাহার ইহজীবনের সমস্ত সমাপ্ত কর্ম্ম জাতির অক্ষয় সম্পদরূপে দেশের মধ্যে ধ্রুব হইয়া রহিল। ইহাই আমাদিগকে বল দিবে, ভরসা দিবে—সঙ্কটের দিনে অনির্ব্বান দীপশিখার মত পথ দেখাইবে। আজ শুধু এই পরাধীন পতিত জাতির মধ্যে এমন শক্তিমান পুরুষ জন্মিয়াছিলেন বলিয়া স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হইব, নিশ্চয় করিয়া জানিব ভারতবর্ষে সমষ্টি-মুক্তির এই অগ্রদূতের কল্যাণময়ী সাধনা

ব্যর্থ হইবার নহে। উপযুক্ত আধার সকল অবলম্বন করিয়া সেই সাধনা অধিকতর মহীয়ান হইবে, ইহা জানিয়া আসুন সকলে করজোড়ে এই দিব্যধাম গত মহাপুরুষের জয়োচ্চারণ করি।*

* ১৩৩৪ সালে ১লা ভাদ্র সারদানন্দজীর দেহরক্ষার পর কলিকাতা এলবার্ট হলে স্বামী অভেদানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় পঠিত।

বিপিনচন্দ্র পাল

অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধীকে বিপিনচন্দ্র কথঞ্চিৎ স্পষ্ট ও প্রকাশ্যে আক্রমণ করিয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাক্ষেত্রে দার্শনিক বিপিনচন্দ্রের চিন্তার ও যুক্তির একটা প্রতিষ্ঠা আছে। বিপিনচন্দ্রের বিশেষত্ব—তাঁহার অখণ্ডনীয় যুক্তি ও তর্ক। তর্ক শাস্ত্রে তিনি চতুর ও অভিজ্ঞ। তার্কিকেরা কল্পনার আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেন না, ভাবের আবেগে নিজেদের ভূমি পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু বিপিনচন্দ্র তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে অবস্থা বিশেষে কল্পনা ও ভাবাবেগের সংমিশ্রন করেন, ইহা তাঁহার আর একটী বিশেষ বিশেষত্ব। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে তিনি প্রাণপণে 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ভারতের রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির এই অভিনব সংঘাতের যুগে তিনি রাজশক্তির সহিত একটা আপোষের কথা যুক্তিদ্বারা স্থির করিয়াছেন। তিনি কোন আকাশ কুসুম কল্পনার দ্বারা যে এই রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে বাস্তবের স্থির ভূমি পরিত্যাগ করেন নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের আন্দোলন এমন কি

ধর্ম্মভাবের সংমিশ্রণ তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। অথচ বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে নাকি ধর্ম্মভাবের 'ওড়ন পাড়ন' আছে, এই আশঙ্কায় শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনচন্দ্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বরিশাল অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে তিনি যে অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রাজনীতির বহির্ভূত অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনাপূর্ণ অতি বিস্তৃত আলোচনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি গান্ধিজীর বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সহিত পঞ্চদশবর্ষ অতীতের বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের একটা তুলনামূলক আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপিনচন্দ্র ও অসহযোগ আন্দোলনের বিপিনচন্দ্র ইহাও তুলনার বস্তু, কেননা বিপিনচন্দ্রও ইতিহাস। বিপিনচন্দ্র বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মাত্র পঞ্চদশ বৎসর ব্যবধানে তুইটী সমশ্রেণীর আন্দোলনকে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু এই তুই যুগের তুই আন্দোলনে তিনি নিজের চিন্তা ও কার্য্যকে নিজে তুলনা করেন নাই, এই জন্য যে অপরে তাহা করিবে।

স্বদেশী আন্দোলনে কলিকাতায় যিনি শিবাজী উৎসবে নানা বিঘ্ন ও প্রতিবাদ সত্বেও ভবানী পূজার একজন প্রধান পাণ্ডা, তিনি আজ অসহযোগ আন্দোলনে খিলাফতের সংমিশ্রণকে রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের সংমিশ্রণ বলিয়া

দুশ্চিন্তায় বিব্রত আছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার অনুপম তর্ক যুক্তি দ্বারা ও অতি আশ্চর্য্য চমকপ্রদ বাক্ বিভূতি দ্বারা পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করিবার সঙ্কল্পে যে আদর্শের কথা তিনি বলিয়াছেন, যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কল্পনা ও ভাবাবেগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তিনি একজন রাজনীতির দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণকারী ভাবুক ছিলেন। তিনি আদর্শবাদী ছিলেন। [প্রথম যৌবনে যিনি এবং যাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজক্ষেত্রে ভাবাবেগ ও আদর্শের দ্বারা চালিত হইয়া জাতিকে চালনা করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র সেই প্রথম যৌবনের কল্পনা ও আদর্শের দ্বারাই রাজনীতিক্ষেত্রে স্বদেশীযুগে চালিত হইয়াছেন। স্বদেশীযুগে বিপিনচন্দ্র আমাদিগকে ভাব দিয়াছেন, আদর্শ দিয়াছেন, কল্পনা দিয়াছেন, অত্যধিক তাপ দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোকও দিয়াছেন। কিন্তু মর্ত্তের অতি কঠোর কঠিন রাজনীতিক্ষেত্রে বাস্তব বলিয়া যাহা রাজনীতিক ধুরন্ধরেরা স্থির করিয়াছেন তাহা বিপিনচন্দ্র স্বদেশীযুগে দেন নাই।] সাহিত্যে ও রাজনীতিক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র অনেক নূতন কথার প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহার প্রখর প্রতিভা হইতে রাজনীতি ও সাহিত্যে অনেক নূতন ভাবের দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই সমস্ত নূতন ভাব একটা বিশেষ নামে বিশেষ পারিভাষিক শব্দে প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়াছে। সাহিত্যে এই রকম একটা নূতন আবিষ্কার—ভাষার আবরণে যাহা

প্রকাশ পাইয়াছে—তাহার নাম বস্তুতন্ত্রহীনতা। যদি আমি তাঁহারই ভাব লইয়া তাঁহারই ভাষায় তাঁহাকে সমালোচনা করি, তবে বলিতে পারি যে স্বদেশীযুগে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যেরূপ ভাবুক ও আদর্শবাদী ছিলেন, সেইরূপ বস্তুতন্ত্রহীনও ছিলেন। ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের মত ও চরিত্র ক্রমে গড়িয়া উঠে। চিন্তায় ও চরিত্রে এই ঘাত প্রতিঘাতের লীলা কি ব্যক্তির জীবনে কি জাতির জীবনে গতিমুখে প্রকাশ পায়। সম্ভবতঃ এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিপিনচন্দ্রে অসহযোগ যুগে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধু গান্ধিজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নহে, ইহা তাঁহার নিজের বিরুদ্ধেও একটা প্রতিবাদ—মস্ত প্রতিবাদ। তাঁহার নিজের চরিত্রের গতিমুখে ইহা একটা সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া; ইহা স্বদেশী আন্দোলনের বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিষেধ। বিপিনচন্দ্রের মানসিক গতির ইতিহাস পর্য্যালোচনাকালে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই তত্ত্বই আমাদের নিকট দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে যে, বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় ও চরিত্রে নিজের বিরুদ্ধে নিজের একটা সংগ্রাম দেখা দিয়াছে। এক কথায় অসহযোগ আন্দোলনের বিপিনচন্দ্র অনেকাংশে স্বদেশী আন্দোলনের বিপিনচন্দ্রকে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং নিজেকে নিজে প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই অবশ্যম্ভাবীরূপে গান্ধিজীকেও প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহা এখনও আমরা সুস্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, ভাবে ভঙ্গীতে

কার্য্যে অসহযোগ আন্দোলনের বিপিনচন্দ্র গান্ধিজীকেই অধিক প্রতিবাদ করিতেছেন, না স্বদেশী আন্দোলনের বিপিনচন্দ্রকেই অধিকতর প্রতিবাদ করিতেছেন!

যে চরিত্রে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে, যে চিন্তায় একের পর আর স্তর ভেদ আছে, সে চরিত্র সে মন জীবন্ত ইতিহাস। বিপিনচন্দ্রের চিন্তা ও চরিত্র রাজনীতিক্ষেত্রে একটা জীবন্ত ইতিহাস বলিয়াই তাহা আলোচনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পরিতেছি না; কোন একটা মত চিরজীবন আঁকড়িয়া থাকা পুণ্য নহে। মত হইতে মতান্তরে, এক স্তর হইতে অন্য স্তরে চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। স্বদেশী ও অসহযোগ যুগদ্বয়ের মধ্যে বিপিনচন্দ্র এক স্তর হইতে অন্য স্তরে, এক মত হইতে মতান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছেন। চিন্তায় তাঁহার স্বাধীনতা আছে; অন্ধভাবে কোন কিছু, তাহা যতই মহৎ হউক যতই দেশব্যাপী হউক যত অধিক যুগধর্ম্মের দ্যোতক হউক—তিনি অনুসরণ করিবেন না। বরং যাহা যত অধিক দেশব্যাপী, তিনি তাহা হইতে একটু সূক্ষ্মরূপে নিজেকে স্বতন্ত্র না করিয়া কখনই নিরস্ত হন নাই। তাঁহার প্রতিভা ইহা স্পর্দ্ধা করিতে পারে। এই স্পর্দ্ধা তাঁহার যৌবনে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে, তাঁহার ভেরী-নিনাদিত স্বদেশী আন্দোলনে, তাঁহার সতর্ক পদবিক্ষেপ-চিহ্নিত ও সাবধানবাণী উচ্চারিত অসহযোগ অন্দোলনের যুগে পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগ দিয়াও

তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম হইতে এতদূর স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন যে ক্রমশঃ তিনি ঐ আন্দোলন হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয়তার তত্ত্ববিশ্লেষণকারী দার্শনিকরূপে অন্যান্য স্বদেশী যুগের নেতৃগণ অপেক্ষা তিনি যথেষ্ট স্বতন্ত্র ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ এমন কি অরবিন্দ হইতেও আদর্শে কোন কোন স্থানে তাঁহার পার্থক্য অস্পষ্ট নহে। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি নিশ্চয়ই মডারেট দলভুক্ত নহেন এবং বাঙ্গলার অসহযোগী নেতাদিগের অগ্রগামী তো নহেনই, পশ্চাতে না হইলেও পার্শ্বে—অনেক দূরে। বিপিনচন্দ্র স্বাধীন চিন্তাশীল ও অতি সূক্ষ্মরূপে সকল নেতা হইতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক, ইহাই তাঁহার প্রতিভার ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

একটী সভায় বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি কবি নহেন, তিনি দার্শনিক নহেন, তিনি সমালোচক। আমরাও মনে করি তিনি সত্যই সমালোচক। সমালোচনা একটা ভাবের বেসাতি। সমালোচনায় ব্যক্তি ও সমাজের মন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার একটা অবসর বা পথ পায়। রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচনার দ্বারা বিপিনচন্দ্র জাতিকে এইরূপ বহু অবসর এবং বহু পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার এই আশ্চর্য্য কৌশলময়ী ক্রিয়া আমাদের মনকে অলস হইতে দেয় নাই। তাঁহার সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক স্কুলের ছাত্রগণ

চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রতিভার একটা গৌরব, ইতিহাসের নিকট ইহা তাঁহার একটা দাবী।

সমালোচককে সমালোচনা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। তথাপি সমালোচকেরও সমালোচনা না হইয়া যায় না। বিশেষতঃ বিপিনচন্দ্র শুধু সমালোচক নহেন, তিনি একজন কর্ম্মী। তিনি মনের চিন্তা নিজের জীবন ও কার্য্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, অন্ততঃ চেষ্টা করেন; সেইজন্য ইতিহাসের নিকট শুধু সমালোচক অপেক্ষা কর্ম্মীর যে বিশেষ দাবী তাহাও তিনি রাখেন এবং এইজন্যই বিপিনচন্দ্র সমালোচনার বস্তু।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, বিপিনচন্দ্র গান্ধিজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন কিনা? এবং যদি দাঁড়াইয়া থাকেন তবে জাতির নিকট তাঁহার কৈফিয়ৎ কি? কিসে অনেকের মনে এমন ধারণা হইল যে, বিপিনচন্দ্র গান্ধিজী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, এমনকি বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন? কোথায়, কখন, কিভাবে, কি ঘটনায় বিপিনচন্দ্র আমাদিগকে এইরূপ মনে করিবার অবসর দিয়াছেন তাহাই বিবেচ্য। বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে বিপিনচন্দ্র যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে বিশেষভাবে জনসাধারণের মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে বিপিনচন্দ্র গান্ধী বিরোধী। এখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক যে সত্যই তিনি গান্ধী বিরোধী কিনা? এবং সত্য হইলে কোন কোন ভাবে

কোন কোন আদর্শে, কোন কোন কার্য্যে তিনি গান্ধী বিরোধী।

২

খিলাফৎ আন্দোলন বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা প্রবল আন্দোলন। এই আন্দোলনে সাধারণভাবে সমস্ত ভারতবাসী যোগ দিতে পারিলেও ইহা বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের আন্দোলন। গান্ধিজী এই খিলাফৎ আন্দোলনে অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের ভূমিকায় কার্য্য করিতেছেন। সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী বিপিনচন্দ্র এই আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতি রাখিয়াও গান্ধীর সহিত একমত নহেন। গান্ধিজীর মত—এই খিলাফৎ সমস্যায় ভারতের মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত পাইয়াছেন। মুসলমানগণ ত ধর্ম্মবিশ্বাসেই ইহার প্রতিবাদ করিবেন। অধিকন্তু হিন্দুগণ ভাইএর প্রতি ভাইএর কর্ত্তব্যানুরোধে মুসলমানদের সহায়তা করিবেন। ইহার জন্য হিন্দুগণ তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্ম আক্রান্ত হইলে যেরূপভাবে প্রতিবাদ করিতেন ঠিক সেইরূপ ভাবে প্রতিবাদ ও ত্যাগস্বীকার করিবেন। ফলে হিন্দুগণ মহাত্মা গান্ধীর আদেশই যথাসম্ভব পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

বৃটিশ যুগে এক বিদেশী শাসনের অধীনে থাকিয়া একই দুঃখের কৃষ্ণ ছায়াতলে দাঁড়াইয়া এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও

হিন্দু মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলনের পথ পাইতেছিলেন না। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাস যে, ভারতের ইংরাজ আমলাতন্ত্র কূট রাজনীতির আশ্রয়ে চতুরতা করিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে এতদিন বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন রাখিতেছিলেন। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এই আমলাতান্ত্রিক শাসন কৌশল ও চাতুরী কোন কোন ঘটনায়, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ফুলারী শাসনের আমলে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই শাসন কৌশল দুর্ব্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, তথাপি ইহা কৌশল এবং এই কৌশল সাময়িকভাবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন এই মুসলমান বিরোধিতায় যত অধিক পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, সাক্ষাৎভাবে রাজ অত্যাচারে তত অধিক হয় নাই। মুসলমান বিরোধিতার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের দিনে শাসকশ্রেণীর হস্তই দেখা গিয়াছিল, সুতরাং উহাও এক প্রকার রাজ অত্যাচার। কৌশলের আবরণে ঐ অত্যাচার হিন্দুর প্রতি মুসলমান বিদ্বেষ রূপে প্রকট হইয়াছিল। মুখোমুখি স্পষ্ট রাজ অত্যাচার অপেক্ষা রাজনীতিক্ষেত্রে কৌশলের আবরণে পীড়ন অধিকতর ভয়াবহ এবং প্রজাশক্তির উপর শাসকদের দিক হইতে অধিকতর কার্য্যকরী। স্বদেশী আন্দোলনে হইয়াছিল তাহাই। বস্তুতঃ মুসলমান অসহযোগিতার জন্য বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে অনেকটা

সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের এক হীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র এমনকি অরবিন্দ পর্য্যন্ত কেহই আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন না। ইঁহাদের কেহ খৃষ্টান, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ বা ব্রাহ্ম-সন্তান। তথাপি এই খৃষ্টান-ব্রাহ্ম নেতৃত্বের স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু ভাবাপন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রধান কারণ জনসাধারণের যে কোন আন্দোলন স্বভাবতঃই তাহাদের ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের, কাজেই এই আন্দোলনকে ধারণ ও বহন করিতে যাইয়া ইহার খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম নেতাগণ পর্য্যন্ত তৎকালে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতে-ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন, এমনকি খৃষ্টান উপাধ্যায় পর্য্যন্ত হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ইহাই যুগধর্ম্মের বিকাশ।

বিপিনচন্দ্র বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনকে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন বলিয়া গৌরব করিতে চাহেন, পরন্তু গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনকে খিলাফৎ সমস্যার সহিত জড়িত বলিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন বলিতে আপত্তি বোধ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে খিলাফৎ সমস্যা জড়িত হওয়ায় এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ স্বরাজের পথ বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া আশঙ্কা করেন। গান্ধিজী খিলাফৎ সমস্যাকে

অসহযোগ আন্দোলনে এত অধিক প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন। নিশ্চয়ই মহাত্মা গান্ধী ইহা খুব বিচার ও বিবেচনা করিয়াই করিয়াছেন, তথাপি বিপিনচন্দ্র ইহার মধ্যে বিঘ্ন ও আশঙ্কা কল্পনা করিয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করিবার দায়িত্ব অনুভব করিয়াছেন। এই সাবধান বাণী পরিশেষে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন। ইহাই অনেকটা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মত দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমি ইহাকে গান্ধিজীর প্রতিবাদ না মনে করিয়া গান্ধিজীর মতের ও কার্য্যের একটা সমালোচনা বলিয়াই গ্রহণ করিব। সমালোচনায় একটা মতের পার্থক্য ফুটিয়া উঠে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিপিনচন্দ্র শুধু সমালোচক নহেন, তিনি কর্ম্মীও বটেন। সুতরাং গান্ধিজী হইতে মতান্তরে বিপিনচন্দ্র যত না অধিক গান্ধী-বিরোধী হইয়াছেন, গান্ধীর সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অসহযোগিতায় তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক গান্ধী-বিরোধী দেখাইতেছে। গান্ধীর সহিত তিনি একমত নহেন, একথা দেশবাসীকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার একটা অভিপ্রায়ও তাঁহার মধ্যে আছে।

ভারতবর্ষে যখন পরস্পর-বিরোধী দুইটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিদ্যমান, তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যে কোন সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মের আন্দোলন মিশ্রিত করা আশু ফলপ্রদ হইলেও পরিণাম নিরাপদ নহে। ভারতবর্ষে কেবল এক

হিন্দু অথবা কেবল এক মুসলমান হইলে প্রজাশক্তির রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ধর্ম্মের আন্দোলন যত নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিত, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা পারে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে কোথাও হিন্দু নাই; কিন্তু মুসলমান আছে, তাহার সম্প্রদায় আছে, স্বাধীন রাজশক্তি আছে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত মুসলমান ধর্ম্মের আন্দোলন মিশ্রিত হইলে সমস্যা এত অধিক জটিল হইয়া উঠে, ভবিষ্যৎ এত কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মনে হয় যে বিপিনচন্দ্র আশঙ্কা না করিয়া পারেন না। গান্ধিজীর কি এই আশঙ্কা নাই? বর্ত্তমান রাজশক্তির নিষ্পেষণে পর্য্যুদস্ত জাতির আত্মমর্য্যাদা রক্ষাকল্পে ভবিষ্যতের মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্লাবন তিনি কি আশঙ্কা করেন নাই? বা করিয়াও বর্ত্তমানে প্রাণের দায়ে তাহা উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন?

* * * * *

স্বদেশী আন্দোলন কার্জ্জনী শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির একটা প্রতিবাদ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার গতিমুখে, বিশেষতঃ মুসলমান অসহযোগিতায় ইহা ক্রমশঃ হিন্দু ধর্ম্মান্দোলনে পরিণত হইবার উপক্রম করে এবং বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্মে ইহার সাময়িক অবসান দেখা যায়। অর্দ্ধোদয় যোগ, দামোদর প্লাবন ইহার দৃষ্টান্ত। যে যুবকশক্তি লইয়া বাঙ্গলার স্বদেশী নেতারা খেলা করিতেছিলেন এবং

যখন একে একে এই সমস্ত নেতারা সময় বুঝিয়া সরিয়া পড়িতেছিলেন, তখন এই রাজনৈতিক যুবকশক্তির বেশীর ভাগ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্মের পতাকাতলে আসিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এমনকি অদ্যকার শ্রীঅরবিন্দও পণ্ডিচেরীতে পলাইবার প্রাক্কালে "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগী" পত্রিকাদ্বয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও তাহার ব্যাখ্যা জাতীয়তার আদর্শ স্বরূপ প্রচার করিয়া এবং পরিশেষে উত্তরপাড়ায় রাজনীতিক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে "বাসুদেব" দেখিয়া তবে ক্ষান্ত হন। এমনকি ব্রাহ্মনেতাগণও সময় সময় "পৌত্তলিক" হইবার উপক্রম করিতেন। বিপিনচন্দ্রও রাজনীতি ছাড়িয়া স্বরাজের যে ব্যাখ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্ম না রাজনীতি এখনও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

ঐতিহাসিক আন্দোলন আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ও বাহিরের চাপ এই দুইএর সংমিশ্রণে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং চাপে পড়িলে রাজনৈতিক আন্দোলনও ক্রমে নির্ঝঞ্ঝাটে ধর্ম্মান্দোলনে পরিসমাপ্ত হয় এবং খিলাফতের মত ধর্ম্মান্দোলনও প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলনরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতে পারে। রাজনীতিক্ষেত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্ম্মকে রাজনৈতিক অস্ত্রস্বরূপে প্রয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই এবং নিছক ধর্ম্মের আন্দোলনও গৌণভাবে রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে নাই তাহা নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইসলামের যে শক্তিকে

শাসকগণ হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনে সেই শক্তিকে গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করিয়াছেন। পঞ্চদশ বর্ষের ব্যবধানে এই একটী মাত্র কার্য্য দ্বারা মহাত্মা গান্ধী এদেশের ইংরাজ আমলাতন্ত্রকে তাঁহার প্রতিভার, তাঁহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার, তাঁহার ক্ষমতার, জনসাধারণের উপর তাঁহার আধিপত্যের পরিমাণ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র গান্ধিজীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আমাদেরও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। একটা কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা আরও সুখী হইতাম যে, স্বদেশী আন্দোলনে যে সমস্ত নেতা দেখা দিয়াছিলেন গান্ধিজী সেরূপ বা সে শ্রেণীর নেতা নহেন। ইতিহাসের কোন আন্দোলন যদি নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতার জন্য পঙ্গু হইয়া থাকে, তবে স্বদেশী আন্দোলন, অন্যান্য কারণ সত্বেও, ঐ কারণের জন্য খুব সহজে পঙ্গু হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট যে আদর্শের কথা, যে উপায়ের কথা তাঁহারা বলিয়াছিলেন দুর্য্যোগের দিনে তাঁহারা সে আদর্শ স্থির রাখিতে পারেন নাই, সে নির্দ্দিষ্ট উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিতে সাহস পান নাই, একথা না বলিয়া বিপিনচন্দ্র নিজেকে বৃথা লঘু করেন কেন? তিনি না বলিলেও আমরা একথা জানিতাম, এবং প্রয়োজন

হইলে বলিতাম যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা "নৌরজী কংগ্রেসে" বাগ্মী বিপিনচন্দ্র আমলাতন্ত্রের সহিত অনেক বিভাগেই অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন ; স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স" বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কেবল বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মত এই তত্ত্ব নিজের জীবনে সাধন করিতে পারেন নাই। যদি বিপিনচন্দ্র বরিশাল সম্মেলনে নিজ চরিত্রের এই অক্ষমতা স্বীকার করিতেন তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এই অপ্রিয় সমালোচনার লজ্জা হইতে অব্যাহতি দিতেন।

৩

যে সময় কলিকাতা কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্র অসহযোগ নীতি ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের তত্ত্ব বিশ্লষণ করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বাক্ বিভূতি দ্বারা বাঙ্গলার যুবজনকে মোহিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এমন কি ঠিক সেই বৎসরই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর গান্ধিজী ট্রান্সভাল-বাসী ভারতীয়গণকে তথাকার গভর্ণমেণ্টের অপমান-জনক আইনের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রবে প্রতিরোধ করিতে দীক্ষিত করিলেন। গান্ধিজী বলিলেন, "তোমরা মুখে মৃদুতা লইয়া অন্তরে বজ্রের দৃঢ়তা

লইয়া ধীর শান্তভাবে অপমানজনক আইন অমান্য কর। তোমরা অস্ত্র ধরিও না, আঘাত করিও না, কলরব ও জনতা করিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ বাধাইও না। শুধু বজ্রের মত মনকে কঠোর করিয়া সহস্র নিপীড়ন সহ্য করিয়া তোমাদের সঙ্কল্প অটুট রাখ। এই সঙ্কল্প অটুট রাখিতে যদি তোমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাও আনন্দে দিবে।" ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মহাত্মা গান্ধী এই আইন অমান্য-কারীদের অগ্রণী হইয়া আদালতে বিচারকের সমক্ষে বলিলেন, "আমি ভারতীয়দিগকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তত্ত্ব শিখাইয়াছি, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি আমাকে দেওয়া হউক।" কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু গান্ধিজী এই অপরাধের চরম দণ্ড না পাইয়া মাত্র দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিলেন। দলে দলে ভারতীয়গণ কারাগারে যাইতে লাগিল। গান্ধিজীর চরণস্পর্শে কারাগার তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। বিপিনচন্দ্র মুখে স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও জানেন যে তিনি ইহা করেন নাই, তিনি ইহা পারেন নাই। ট্রান্সভালের ভারতীয় পুরুষ মাত্র নয় হাজার ছিল, তাহার মধ্যে দুই হাজার সাতশত জন গান্ধিজীর অনুসরণে কারাগারে উপস্থিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ বন্দীদের জন্য যতদূর সম্ভব জঘন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। অত্যাচার ও উপদ্রব চলিতে লাগিল কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারিগণ একবার জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া

পুনরায় জেলে যাইতে লাগিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ কিছুতেই তাহাদের দমন করিতে পারিলেন না। গান্ধিজী জেল হইতে বাহির হইয়াই পুনরায় আইন ভঙ্গ করিলেন। তিনি বলিলেন, "যতদিন গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়গণ সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে বিরত থাকিবেন ততদিন ধীর ও সংযত ভাবে আমি বারম্বার আইন অমান্য করিবই করিব।" এবার গান্ধিজীর প্রতি দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। কি বিনাশ্রম কি সশ্রম গান্ধিজীর বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সমস্ত নির্য্যাতনই পণ্ডশ্রম হইয়া গেল। গান্ধিজী নিরুপদ্রবে পুণঃ পুণঃ প্রতিরোধ করিয়া পরিশেষে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে অনেকাংশে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিতও বটে ইহা ইতিহাসও বটে। বঙ্গভূমি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় একই সময়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কথা শুনা গিয়াছিল। বাঙ্গালী বিপিনচন্দ্র শুধু বক্তৃতা করিয়াছিলেন, গুজরাটী গান্ধী শুধু বক্তৃতা করেন নাই। বাঙ্গলা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এই তফাৎ ছিল। গান্ধী ও বিপিনচন্দ্রে প্রথম হইতেই এই পার্থক্য ছিল, আশঙ্কা হয় এখনও আছে। গান্ধিজীর ভূমি হইতে সাধারণের চক্ষে আজ যে শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্রকে দূরে স্বতন্ত্র দেখা যায়, এই স্বাতন্ত্র্য ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই বিদ্যমান ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য বাক্য ও কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য দৃঢ়তা ও তাহার অভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং—আর অধিক না বলাই সঙ্গত।

বিপিনচন্দ্র পূর্ব্বেই বলিয়াছি তার্কিক। তাঁহার কথায় সর্ব্বত্রই একটা বড় রকনের বাঁধুনি আছে, একটা সামঞ্জস্য সর্ব্বত্রই বিরাজমান। কিন্তু রাজনীতি শুধু কথা নয়—রাজনীতি কার্য্যও। বিপিনচন্দ্রের যা কিছু অসঙ্গতি নিশ্চয়ই তাঁহার লজিকে নয়,—তাঁহার কথার বিপরীত কার্য্যে। এই খানেই প্রকৃত ম্যাজিক এবং বড়ই ট্রাজিক। গান্ধিজী শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ পুরোহিত নহেন তিনি এই মন্ত্রের সাধক, এই মন্ত্রের সাধনায় তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ। বিপিনচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেও সত্যই তিনি এই পথের 'মহাজন'। তাই তাঁহার অঙ্গুলি হেলনে অসংখ্য নরনারী এই পথে ধাবিত হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করিবার মহা দায়িত্ব তিনি আজীবন গৌরবোন্নত শিরে বহন করিতেছেন। হিংসা দ্বেষ শূন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যাপারে বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করিবার অক্ষমতা বিপিনচন্দ্রের চরিত্রে যত অধিক, বোধ হয় জীবিত কোন নেতার মধ্যেই ইহা এত অধিক নহে। কথার পর কথায় তাঁহার লজিক্ আছে কথার পর কাজে তাঁহার লজিক্ নাই। তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের একজন বক্তা, কিন্তু কর্ম্মী নহেন, নেতাও নহেন। সুতরাং বলা বাহুল্য বক্তা মাত্রই নেতা নহেন। শুধু বাক্য দ্বারা কংগ্রেসের সভাপতিও হওয়া যায়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নেতা শুধু বাক্যদ্বারা

হওয়া যায় না। শুধু বচন যাঁহাদের সম্বল চরিত্রে যাঁহারা নিঃসম্বল নেতা হিসাবে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য তত অধিক। এই জন্য বিপিনচন্দ্র দেশদ্রোহী নহেন, তাঁহার ভাগ্য বড় মন্দ।

বিপিনচন্দ্র তুলনা করেন, তুলনায় স্পর্দ্ধা করেন যে অসহযোগ আন্দোলনে কোন মৌলিকত্ব নাই। ইহার সমস্তই স্বদেশী আন্দোলনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গান্ধিজীকে যদি অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ধরা যায় এবং শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্রকে যদি স্বদেশী যুগের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ববিশ্লেষণকারী বক্তা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বিপিনচন্দ্র তত্ত্ব হিসাবেও মহাত্মা গান্ধী হইতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধেও কিছু নূতন বা মৌলিক আবিষ্কার দিতে পারেন নাই। বিপিনচন্দ্র ইহা স্পষ্ট বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আভাষ ও ইঙ্গিত বিশেষ অস্পষ্ট নয়। কিন্তু আমরা যেমন স্বদেশী আন্দোলন হইতে অসহযোগ আন্দোলনের গুরুতর পার্থক্যকেও স্বীকার করি, তেমনি বিপিনচন্দ্র প্রমুখ স্বদেশী যুগের নেতাগণ হইতে মহাত্মা গান্ধীর অলৌকিকত্ব না হউক অনুপম নূতনত্ব অকুতোভয়ে স্বীকার করি। গান্ধিজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রথম হইতেই অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিপিনচন্দ্রের হস্তে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অনেকটা হিংসার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতিক্ষেত্রে হিংসার এক অতি সূক্ষ্ম রকমের

দার্শনিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন। যখন বিপিনচন্দ্র "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজ সম্পাদন করিতেছিলেন তখন জন্মভূমির যে ছবি তিনি আঁকিয়াছিলেন সেই ছবির নীচে আত্মরক্ষা অথবা আক্রমণের জন্য পৃথিবীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রকেই তিনি সংগ্রহ করিয়া ধরিয়াছিলেন। 'ন্যাংটা কালী রক্ত চায়'— রাজনৈতিক সভায় তাঁহার মুখ হইতে অতি দাপটের সহিত এই কথা বাহির হইতেও আমরা শুনিয়াছি। ব্যক্তিগত জীবনে কিরূপ তাহা আমরা জানিনা, রাজনৈতিক জীবনে তাঁহার মধ্যে একটা হিংসা দ্বেষের ভাব স্পষ্টই আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।

বিপিনচন্দ্রের প্রতিভা প্রখর উজ্জ্বল বিদ্যুৎপ্রবাহের মত আশ্চর্য্য কৌশলময়ী, চমকপ্রদ,—ক্ষণস্থায়ী। বিপিনচন্দ্রের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ সত্ত্বেও তিনি অবিবেকী নহেন। বিবেকের খাতিরে একবার এবং সেই প্রথম ও শেষবার তিনি কারাক্লেশ সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার বিবেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাহার পর হইতেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বক্তা হিসাবে আরও কতবার কারাগারের দ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে কিন্তু সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। প্রতি সুযোগের সন্ধিক্ষণে তিনি তৈলসিক্ত ব্যক্তির মত পিছলাইয়া খসিয়া পড়িয়াছেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভূমিতে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার চরণ অস্থির চঞ্চল, পলায়নোন্মুখ, পক্ষান্তরে মহাত্মাজীর চরণ দৃঢ়নিবদ্ধ; উহা স্থির, অটল,

বোধ হয় মৃত্যুও উহাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তত্ত্ব মহাত্মাজীর চরণচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আজ জগতে সভ্যজাতিদিগের সম্মুখে পরিচিত হইয়াছে। কাল ইহা ইতিহাসের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিজয়কেতন উড়াইয়া হয়ত সমস্ত সভ্যজাতির কণ্ঠে বিঘোষিত হইবে।

বিপিনচন্দ্র বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে এমন একটা আভাষও দিয়াছেন যে গান্ধী-কল্পিত স্বরাজ একটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র এবং এই অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট না করিলে ভবিষ্যতে অনেক বিঘ্ন দেখা দিবে। অতএব বিপিনচন্দ্র বলেন যে আমাদের ভবিষ্যত স্বরাজ যে গণতন্ত্র-মূলক হইবে ইহা এখন হইতেই বলা উচিত এবং সকলেরই উহা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। নতুবা বৃটিশ আমলা-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর হইলেও ভারতীয় কোন শাসন-তন্ত্র প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা ও সুযোগ ঘটিলেও তাহা যে গণতন্ত্রমূলক হইবে ইহার স্থিরতা কি? বৃটিশ-রাজের পরিবর্ত্তে যদি মুসলমান-রাজ অথবা শিখ-রাজের অভ্যুদয় হয়, ভারতের জনসাধারণ যেরূপ মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাহারা যদি গান্ধিজীকে ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে —তবে উপায়? শিক্ষিত বাঙ্গালী একদিন তাঁহাদের সুরেন্দ্র-নাথের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং ডিমোক্রাট্ সুরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে সে রাজমুকুট পরিধান করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত দৃঢ়তার

সহিত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভবিষ্যৎ স্বরাজের আকার ও গঠন ভবিষ্যতের স্বরাজপন্থীরা স্থির করিবেন এখন বাচালতার সময় নাই।

শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র আরও কতকগুলি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অসহযোগ নীতি অবলম্বনে স্বরাজ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অসহযোগ আন্দোলনে আমলাতন্ত্র তাহাদের বিপদ বুঝিয়া আমাদের সহিত একটা আপোষ করিতে বাধ্য হইবেন। আমরা যদি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অসহযোগীই থাকি, এমনকি আপোষের সময়ও সহযোগ না করি তবে বর্ত্তমান পদ্ধতি অবলম্বনে স্বরাজ কিছুতেই লাভ হইবে না। মহাত্মাজী আপোষে রাজী হইবেন কি না? এবং আপোষ করিতে গেলে অসহযোগ নীতি অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না? অসহযোগ আদর্শ নহে,—একটা উপায় মাত্র। দায়ে পড়িয়াই এই উপায় ভারতবাসী অবলম্বন করিয়াছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, যদি সেই উদ্দেশ্য সাধন হয়, তবে পুনরায় সহযোগ অবশ্য কর্ত্তব্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধী এই অসযোগ নীতি উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া অভিষ্ট সিদ্ধ হইলে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারতবাসীর সম্মান অক্ষত রাখিয়া একাধিকবার অপোষ করিয়াছেন। সুতরাং গান্ধিজী ভারতীয় আমলাতন্ত্রের সহিত আপোষে নারাজ হইবেন অথবা উপায়কে উদ্দেশ্য

বলিয়া ভ্রম করিবেন বিপিনচন্দ্রের এমন আশঙ্কা নিতান্তই

৪

শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সমগ্র ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের তুলনা করিবার একটা সুযোগ গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে তুলনা করিয়াছেন যাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, আংশিক সত্য। এই দুইটী আন্দোলন একের পর আর দেখা দিয়াছে বলিয়াই যে ইহার একটী আর একটীকে সম্ভব করিয়াছে অথবা এই দুইটীর প্রকৃতি সামর্থ্য ও সম্ভাবনা একই তাহা আমরা মনে করি না। এই তুলনা প্রসঙ্গে আর একটী কথা আমাদের মনে হইয়াছে। তাহা বিপিনচন্দ্রের সমালোচনার প্রতিকূল হইলেও আমাদিগকে বলিতেই হইবে। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সহিত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের যোগ যতটা অধিক এবং ঘনিষ্ঠ, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের যোগ ততটা অধিক ও ঘনিষ্ঠ নহে। আমরা দেখিয়াছি ও দেখাইয়াছি যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী আন্দোলন এবং বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন তত্ত্বের দিক হইতে অনেকটা এক হইলেও, বাস্তবের দিক হইতে এই দুই আন্দোলন প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনে তত্ত্ব আছে

সাধনা নাই, কথা আছে কাজ নাই, আদর্শ আছে চরিত্র নাই ; দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে তত্ত্ব ও সাধন, কথা ও কাজ, আদর্শ ও চরিত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বারুদ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছিন্ন থাকিলে যাহা ঘটে একত্রিত হইলে তাহা ঘটে না, অঘটন ঘটে। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের সাধনহীন তত্ত্বকথা বুদ্বুদের মত হাওয়ায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিছু কাজ করে নাই তাহা নহে। ইতিহাসের প্রত্যেক প্লাবনই কিছু পলি রাখিয়া যায়। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন নিশ্চয়ই বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কিছু জমি তৈয়ার করিয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বিস্মরণ হই নাই, কাহাকেও বিস্মরণ হইতে বলি না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, বাঙ্গলায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে সে সাফল্য লাভ হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হইয়াছে নিয়মতন্ত্রমূলক দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলনে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ উপায় এখানে কেহই অবলম্বন করেন নাই, জাতিকে অবলম্বন করাইতে সক্ষম হন নাই। স্বদেশী আন্দোলনে এই সাধনা ছিল না। যাহা ছিল তাহা আগেই বলিয়াছি—তাহা সাধনহীন তত্ত্বকথা মাত্র। অতএব বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন এক বস্তু নহে। দৃশ্যতঃ এক হইলেও মূলতঃ পৃথক। আশা করি সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শী বিপিনচন্দ্র ইহা নিরীক্ষণ করিবেন। ১৯০৬ এর দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে দেখা দিয়াছে এবং সেই আন্দোলনের জীবন্ত বিগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রতি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছি। জগতের এবং ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিগত যুদ্ধে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তথাপি শুধু রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ভারতবক্ষে এই ইতিহাসে স্মরণীয় বিরাট আন্দোলন সম্ভব হয় নাই। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র একথা বিস্মৃত হইলেও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। সকলেই সব পারে না—তাহা লইয়া যে হিংসা দ্বেষ চলে সেই অক্ষমের অভিমান বালক অথবা স্ত্রীলোকে সম্ভব, মহামনা পুরুষে সম্ভব নয়।

বাঙ্গলায় তত্ত্ব ছিল, আবার বলি বাঙ্গলায় তত্ত্ব ছিল, সাধনা ছিল না, আদর্শ ছিল, নিষ্ঠা ছিল না মেধা ছিল দৃঢ়তা ছিল না। বাঙ্গলা যাহা করিতে পারিত, বাঙ্গালী নেতারা তাহা করিতে দেয় নাই। একথা আজ না বুঝিলেও কাল বুঝিতে হইবে। ইতিহাসে "চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধন" সম্ভবপর নয়, কেহ পারে নাই, পারিবে না। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বিতীয় অধ্যায়,—বাঙ্গলার আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় নহে। বাঙ্গলায় পঞ্চদশবর্ষ অতীতের যে ধ্বনি—নিশ্চয়ই এ আন্দোলন তাহার প্রতিধ্বনি

নয়। ইহা কাহারও প্রতিধ্বনি নয়। মহাত্মা গান্ধী কাহারও পরিত্যক্ত ভেরী ভারতবক্ষে নিনাদিত করিতেছেন না। এ ভেরী, এ তূর্য্য নিনাদ—তাঁহার নিজের। এ বিষাণ—ঈশানের! এ আরাব—মহাভৈরবের কণ্ঠ নিঃসৃত! এ নৃত্য—তাণ্ডব! এ ভূমিকম্প—প্রলয়! কিন্তু প্রলয় শেষ নয়, সৃষ্টিও আদি নয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একের পর আর নিয়তির চক্রে মহাকালের বক্ষের উপর দিয়া অনন্তকাল ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়াছে।

গান্ধিজী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সমষ্টিমুক্তির এক উদ্দাম কল্পনা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্থান কাল পাত্রভেদে হয়ত ইহা অনিবার্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমষ্টি মুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই কল্পনা, এই বিপুল অধ্যবসায় যে এক বিরাট মহাপ্রাণ হইতে অনুসৃত হইয়াছে তাহা ভারতের পারমার্থিক জগতে কেবল বুদ্ধ ও শঙ্করে সম্ভব হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে আজ গান্ধী রাজনৈতিক ভূমিতে পাদচারণা করিতেছেন। ঘটনার চক্র যদি উল্টা দিকে ঘুরিয়া যাইত, পারমার্থিক জগতে যদি এই মহাপুরুষ ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় আবির্ভূত হইতেন, তবে ইঁহার স্থান বুদ্ধ ও শঙ্করের পার্শ্বে হইত, নিম্নে নহে।

ভারতের রাষ্ট্রকেশরী আজ অনশনক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ দেহযষ্টি, কটিমাত্র বস্ত্র আবরণে জগতের সম্মুখে প্রকাশিত। পৃথিবীর

ইতিহাসে এই রাষ্ট্রবীর নিশ্চয়ই একদিন তাঁহার বিধিনির্দ্দিষ্ট স্থান করিয়া লইতে পারিবেন। যিনি আজ ভিক্ষান্নে পরিতুষ্ট, কৌপীন সম্বল তিনি তাঁহার বিশালবক্ষে রাজনৈতিক হিন্দু ও মুসলমানকে জড়াইয়া ধরিয়া ভারতের ইতিহাস ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দিতেছেন। ইতিহাস ভাঙ্গে, ইতিহাস গড়ে—ইহা বিধির বিধান। বিধির বিধান অলঙ্ঘ্যনীয়, যেমন আকাশের বজ্র অলঙ্ঘ্যনীয়। এই মহামানবের চরণতলে এক মহাপ্রলয় ছুলিতেছে, সৃষ্টিও বুঝি বা বহুদূরে নয়। দুঃখের বিষয় এক বিপরীত শিক্ষা সভ্যতায় বিপর্য্যস্ত ইংরাজীনবীশ ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীকে ষোল আনা দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরাও তাহা পারিতেছি না। তথাপি পর্ব্বতের নিকট মাথা নত হইয়া আসে, সমুদ্রের অবাধ বিস্তারে চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া থাকে, আকাশের অসীম নীলিমায় চিত্ত উদাস হইয়া যায়, এক বিরাট ভূমিকম্পের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না, প্রলয় ঝঞ্ঝায় বিচার বিশ্লেষণ প্রতিবাদ শুষ্ক তৃণের মত কোথায় উড়িয়া যায়।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্মের নবযুগের নূতন সাধক কবি ও বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন, দয়ালু ও প্রেমিক চিত্তরঞ্জন, আদর্শবাদী পরদুঃখ-কাতর সহজ-দাতা ত্যাগী চিত্তরঞ্জন আজ রাজনীতিক্ষেত্রে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে, উদ্যতফণা ফেণিল তরঙ্গ-শীর্ষে কিছুমাত্র নিজের জন্য চিন্তা না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিম আকাশে রক্তিমাভা, সমস্ত দিঙ্মণ্ডলে ঝটিকার পূর্ব্বাভাষ, গোয়ালন্দের বিশাল পদ্মা দুকূল ছাপাইয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, পশ্চাতে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া দেশের কার্য্যে দেশবন্ধু অকূলপাথারে অনির্দ্দেশ যাত্রায় তরী ভাসাইলেন। কি আকর্ষণে, এই মহাপুরুষ অর্থোপার্জ্জনের, সংসারের স্ত্রী-পুত্রের সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া গেলেন? সমস্ত বঙ্গদেশে আজিকার আন্দোলনে চিত্তরঞ্জনের শির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবে উন্নত, ত্যাগে পবিত্র, মহিমায় উজ্জ্বল। নিখিল ভারতে মহাত্মা গান্ধীর অ-সহযোগ আন্দোলনে বাঙ্গলার পক্ষ হইতে বাঙ্গালীর প্রতিনিধিস্বরূপ চিত্তরঞ্জন গান্ধিজীর অনুগামী হইয়া সহযাত্রী হইয়াছেন, পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলায় স্বদেশী আন্দোলনের দিনে যিনি এবং যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, আজ অ-সহযোগ আন্দোলনের দিনে তাঁহাদের মধ্যে কেহই

চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে নহেন, কেহ বা পার্শ্বে, দক্ষিণে ও বামে, কেহ বা পশ্চাতে—বহু দূরে। দেশের ও জাতির স্বাধীনতার জন্য যে কর্ম্মক্ষেত্র, সেই পুণ্যক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন কি করিয়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলেন, আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কবি চিত্তরঞ্জন একস্থলে বলিয়াছেন, 'ফুল কখনও একদিনে ফোটে না' ; অতীতের কত লীলাখেলা কত বিবর্ত্তন বিকাশ কত জন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রভাতের শিশিরস্নাত পুষ্পটী সূর্য্যের আলোকে চক্ষু মেলিয়া চায়। ফুলের ক্রমবিকাশে কবি যাহা বলিয়াছেন, রাজনৈতিক নেতার মানসিক বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব বাহির হইতে দেখিতে গেলে যতটা আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, মানসিক বিকাশ ও চরিত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা একটা স্বাভাবিক ও সহজ পরিণতি মাত্র। চিত্তরঞ্জনের 'স্বভাবধর্ম্ম' বলিয়া একটা পদার্থ আছে। সেই স্বভাবধর্ম্মের প্রেরণায় ও পরিণতির মুখে আজ তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে বহুর মধ্যে এক ও অদ্বিতীয়। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার পূর্ব্বে যাঁহারা এই আত্মভোলা সরল ও উদার পরদুঃখকাতর মনুষ্যটীর সাহিত্যিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলার প্রাণ লইয়া সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব ও

কোলাহলের মধ্যে এই মনুষ্যটির অন্তরাত্মা ভিতরে ভিতরে এক মহামৌন তপস্যায় মধ্যে অবিরত ডুবিয়া আছে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই মনুষ্য বাহির হইয়া পড়িবে, কিন্তু সে বাহির যে কোথায় তখন তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় নাই। ত্যাগের জন্য সাধক আপনার মনে প্রস্তুত হইতেছিলেন—কিন্তু কিসের জন্য, কিসের আশায়, তাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন যে এই আকার ধারণ করিবে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাহা সম্ভবতঃ চিত্তরঞ্জনও পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি বাঙ্গলার ও বাঙ্গালী সভ্যতার মর্ম্মস্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রাণ-ধর্ম্মের জন্য, বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের জন্য যে আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি আত্ম-পরিচয় ও সেই সঙ্গে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর পরিচয় বিশ্ব-সাহিত্যের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমের পরেও বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অল্পবিস্তর দাগ রাখিয়া যাইবে। চণ্ডীদাসের কাব্য ও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লইয়া তিনি বাঙ্গালী-সভ্যতার ও বাঙ্গলার প্রাণের যে পরিচয় দিতেছিলেন তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু অংশে প্রতিবাদ-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা কোন বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যকে প্রতিবাদ করা চিত্তরঞ্জনের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মে আত্ম-সমাহিত

হইতেছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে যাহা কিছু প্রতিবাদের মত দেখা দিয়াছে তাহাও অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য, কিন্তু তথাপি তাহা সাময়িক ও একটা গৌণ উপায় মাত্র। বস্তুতঃ বাঙ্গালীকে তাহার স্বভাবধর্ম্মে, তাহার প্রাণধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই বঙ্কিমের পর এই প্রাণ-ধর্ম্মী কবি একটা ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা অতীতকাল ব্যবহার করিলাম, কেননা, এখন আর তিনি সাহিত্যিক নহেন। তাঁহার সাহিত্যিক আন্দোলনের গতি একেবারে থামিয়া না গেলেও অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক-আন্দোলনের সহিত এই রাজনৈতিক-আন্দোলনের একটা যোগসূত্র বাহির করিয়া দেখাইতে না পারিলে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্ফল। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় একটী ভাবকে সর্ব্বদা প্রতিবাদ করিয়াছেন। সাহিত্য ও ধর্ম্মে বাঙ্গালী রাজা রামমোহন হইতেই ফেরঙ্গ-ভাবদাসত্বে আত্ম বিক্রয় করিয়াছে। এইজন্য ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও সমাজে চিত্তরঞ্জন এই ফেরঙ্গ-দাসত্বের এমন প্রখর ও প্রচণ্ড প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন। যে ভাব-দাসত্বের প্রতিবাদ মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের পূর্ব্বে তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির সম্মুখে প্রচার করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পরে, তিনি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফেরঙ্গ-দাসত্বের

প্রতিবাদ করিতে গিয়া গান্ধীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান, ইহাতে তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্মের এক অতি ব্যাপক পরিণতি আমরা দেখিতে পাই। সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়ার মধ্যে মানসিক বিকাশের ইতিহাসের পথ দিয়া দেখিতে গেলে আকস্মিক বা অসঙ্গত কিছুই দৃষ্ট হইবে না। ফেরঙ্গ-ভাব-দাসত্বের প্রতিবাদ করাই যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য তিনি সাহিত্য বা রাজনীতি যে কোন ক্ষেত্রেই দণ্ডায়মান হউন, সেই একই ভাবে পরিচালিত হইবেন। সাহিত্য হইতে রাজনীতিতে প্রস্থানের পথে বাহিরের দিক হইতে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেলেও, অন্তরের দিক হইতে দেখিতে গেলে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না। তিনি ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে চলিয়া যাইবার পথে জীবনের উদ্দাম ও প্রচণ্ড গতিমুখে একই মহাভাবের অনুসরণ করিয়াছেন—একই অনুরাগে পাগল হইয়া ছুটিয়াছেন। সাহিত্য ও রাজনীতির চিত্তরঞ্জন, অন্তরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে—দুই নহে এক, অবিচ্ছিন্ন, সোপানের পর সোপানমাত্র। অতএব অন্ধভাবে মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করিতে যাইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে সহসা রাজনৈতিক নেতা হইয়া ফুটিয়াছেন, একথা সত্য নহে।

অবশ্য মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করিবার মত ক্ষমতা মনুষ্য-সমাজে অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটী মনুষ্যের আছে। মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করা, দুর্ব্বলতা নহে, বরং এক

অসাধারণ চরিত্রবলের পরিচায়ক। কিন্তু শুধু গান্ধীর জন্যই গান্ধীকে তিনি অনুসরণ করেন নাই, বরং ইহাই বলা সঙ্গত হইবে যে চিত্তরঞ্জন নিজের স্বভাব-ধর্ম্মের অনুসরণে জীবন পথে চলিতে গিয়া সহসা মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় একসঙ্গে সহযাত্রী হইয়াছেন। ভারতবক্ষে ইঁহারা উভয়েই এখন জীবন্ত বিগ্রহ। কতদিন ইঁহারা একসঙ্গে থাকিবেন এবং কোনদিন ইঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইবে কিনা, তাহা মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া কেহই বলিতে পারে না। তবে আমরা চিত্তরঞ্জনের মানসিক বিকাশের স্তরগুলি একের পর আর বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে তিনি কেবল গান্ধীকে দেখিয়াই গান্ধীর অনুসরণ করেন নাই, নিজের প্রাণ-ধর্ম্মের প্রেরণায় নিজের স্বভাবের বিকাশ পথে তিনি কিছুক্ষণ এবং এই বর্ত্তমান আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত একসঙ্গে চলিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনের অধ্যায়গুলি একের পর আর যখন যথাযথ ও সুসম্বদ্ধরূপে লেখা হইবে তখন সাহিত্য-অধ্যায়ের সঙ্গে জীবিকা-উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে আইন-ব্যবসায়-রূপ যে অধ্যায়, তাহাও অতি বিস্তৃত রকমে তাঁহার জীবনীরূপে ও জাতির ইতিহাস রূপে একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। কোন আইন-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-জীবন জাতির ইতিহাসরূপে যদি পরিগণিত হয়, তবে তাহা চিত্তরঞ্জনেই সম্ভব হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন ব্রিটিশ-যুগে ইংরাজের বিচারালয়ে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী

ব্যবহারজীবী। বাঙ্গলার স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ রাজবিদ্রোহের মামলা লইয়া ভারতবাসী ও ইংরাজ-আদালত বিব্রত হইয়াছে, যে বিচার এবং বিচার ফল সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, এমন কি ইংলণ্ডের তট-ভূমিকে আঘাত করিয়াছে, সেই সমস্ত স্মরণীয় ঐতিহাসিক রাজবিদ্রোহের মামলায় ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থনের জন্য যদি কেবল একজন ব্যবহারজীবির নাম করিতে হয় তবে চিত্তরঞ্জনের নামই উল্লেখ করিতে হইবে। কেবল ব্যবসায়ের অনুরোধে, কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য চিত্তরঞ্জন গত দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্মরণীয় রাজবিদ্রোহের মামলায় ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থনের জন্য নিজ শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর অনেক মামলায় নিযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য রাজদ্রোহমূলক সমস্ত মামলায় তিনি ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় আমরা চিত্তরঞ্জনকে প্রথম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তিতে দেদীপ্যমান দেখি। যেদিন অরবিন্দ প্রমুখ বহু নির্দ্দোষী ব্যক্তিদের মুণ্ড লইয়া রাজদ্বার ও শ্মশানের বায়ু অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছিল, সেদিন এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি আর একজন ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যবহার-জীবীর হস্ত হইতে এই মামলার ভার গ্রহণ করিয়া রাজদ্বার

ও শ্মশান এই উভয়স্থানের ভীতি হইতে নির্দ্দোষীদের রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহা চিত্তরঞ্জনের জীবনের এক অতি গৌরবময় ঘটনা। সেই সঙ্গে ইহা জাতির ইতিহাসের একটা অধ্যায়। রাজদ্বার ও শ্মশানের ভয় হইতে যিনি রক্ষা করেন, শাস্ত্র তাঁহাকে বান্ধব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বদেশী-যুগের পর হইতে রাজদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত অথবা নির্দ্দোষী স্বদেশ-প্রেমিকদিগকে রাজদ্বার হইতে রক্ষা করা কেবল কয়েকটী ব্যক্তি-বিশেষের উপকার করা নহে, পরন্তু ইহা এক গুরুতর কলঙ্ক হইতে দেশবাসীর সুনাম রক্ষা করা। বিচক্ষণ মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন অতি দক্ষতার সহিত, অতি গৌরবের সহিত ইংরাজের বিচারালয়ে মিথ্যা-রাজদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত বহু মোকর্দ্দমায় পৃথিবীর সম্মুখে ভারত-বাসীর সুনাম কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। শাস্ত্রের নির্দ্দেশমতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই চিত্তরঞ্জন দেশের নিকট 'দেশবন্ধু' আখ্যা পাইবার অধিকারী।

অনেকে আক্ষেপ করেন যে চিত্তরঞ্জনকে নিয়মিতরূপে রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি অকস্মাৎ রাজনীতি-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে একরূপ অভিযোগের মত শুনায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই অভিযোগের মূল ও সত্যতা আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ১৯০৬এর কলিকাতার বিখ্যাত নৌরজী-স্বরাজ-কংগ্রেসে

আমরা চিত্তরঞ্জনকে দেখিতে পাই। কংগ্রেসই জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভূমি। প্রজাশক্তি তাহাদের সমস্ত দলবল লইয়া এই কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হয়। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কেন্দ্রভূমিতে কেবল মিলন নহে বিরোধেরও প্রথম সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ২০ বৎসর কংগ্রেসী রাজনীতি অনেকটা একই ভাবে একই ভঙ্গীমায় রাজা ও প্রজার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন যখন হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতেই বাঙ্গলা তথা নিখিল ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে আর এক নূতন যুগের আবির্ভাব দেখা যায়। ইতিহাস ইহাকে স্বদেশী-যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এই স্বদেশী-যুগে যে নূতন ভাব, নূতন তরঙ্গ, নূতন প্রেরণা রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, তাহা বিনা প্রতিবাদে কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ কংগ্রেস-রাজনীতি তাহার অতীত ২০ বৎসরের চিরাভ্যস্ত পথে চলিতে চলিতে বহু পরিমাণে জড়ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল, একটা রক্ষণশীলতার আবরণে স্বদেশীর নূতন ভাব নূতন প্রেরণাকে কংগ্রেস বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে নাই। এইখানেই কংগ্রেস রাজনীতির বল এবং এইখানেই উহার দুর্ব্বলতা। নিয়মতন্ত্র-প্রণালী দ্বারা পরিচালিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সহসা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের ভাব গঠন ও ভঙ্গীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। কিছু আন্দোলন, কিছু প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী,

হইয়াছিল ও তাহাই। যদি স্বদেশীর বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস কোন প্রতিবাদ না করিত; তবে কংগ্রেসকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না। কংগ্রেসের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যদি না কোন দিন এই স্বদেশীর ভাব ও প্রেরণা কংগ্রেসে প্রবেশাধিকার স্বীয় শক্তিবলে না করিতে পারিত, তবে স্বদেশীর এই ভাব ও প্রেরণার সামর্থ্যও আমরা বুঝিতে পারিতাম না। স্বদেশী-যুগের বয়কট-নীতি কংগ্রেসে প্রবেশ করাইতে গিয়া স্বদেশী-যুগের অগ্রগামী নেতাগণ কংগ্রেস হইতে নিজেরাই বয়কট হইয়াছিলেন। স্বদেশী-যুগে যাঁহারা কংগ্রেসে বিলাতী বস্ত্র ও এমন কি, বিদেশী-শাসনের কোন বিভাগ বয়কট করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে কংগ্রেস ঐ সমস্ত অগ্রগামী স্বদেশী-নেতাদিগকে 'বয়কট' না করিয়া ছাড়েন নাই। কংগ্রেস-মণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত স্বদেশী-যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমরা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশকেও দেখিতে পাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নৌরজী-কংগ্রেসে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির বৈঠকে 'বয়কট' প্রস্তাব লইয়া যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহাতে কংগ্রেসের মধ্যে সেই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় ও কাজেই অন্যপক্ষে বিজাতীয় দুইটী দল আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহীতার মামলাগুলি একের পর আর উপস্থিত হওয়ায় রাজশক্তি স্বদেশী-নেতাদিগের উপর কিছু তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রয়োগ

করেন। বাঙ্গলার স্বদেশী-নেতাদিগের চরিত্রবল লোকমান্য তিলক বা মহাত্মা গান্ধীর মত ছিল না। অন্তরীণে আবদ্ধ করার উপায় ও নেতাদিগকে চোখ রাঙ্গাইয়া, ভয় দেখাইয়া দূরে রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এই আন্দোলন বহু পরিমাণে দমন করিয়া ফেলেন। ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে স্বদেশী-যুগ যখন এইরূপে স্তিমিত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিতেছিল, তখন এবং সেই কয় বৎসর কংগ্রেস-মণ্ডপে জাতীয়দলের কোনই প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল বিজাতীয়-দল বৈদেশিক-রাজনীতির নিষ্ফল অনুকরণ বৎসরের পর বৎসর ব্রত-রক্ষার মত করিয়া আসিতেছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জাতীয়দল কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির বৈঠক হইতে তাঁহাদের ইচ্ছামত বয়কট্ প্রস্তাব চালাইতে না পারিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের বিস্তীর্ণ আইন-লাইব্রেরীর মন্ত্রণা-কক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন স্বদেশী-যুগের অগ্রগামী নেতৃবৃন্দের সহিত এক সঙ্গে এক মন্ত্রণাগৃহে আবদ্ধ। ঐ বৎসরের পর হইতে কংগ্রেসের বৈঠকে চিত্তরঞ্জন নিয়মিত-রূপে প্রতিবৎসর হাজিরা দেন নাই। যদি এই ঘটনা দ্বারা কেহ প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হন যে ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ বৎসর কংগ্রেসে উপস্থিত হন নাই বলিয়া চিত্তরঞ্জন রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তবে তাহা তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি আলোচনা

করিয়া বলিতে গেলে সত্য কথা বলা হইবে না। প্রথমতঃ যে কয়বৎসর স্বদেশী-যুগের কোন অগ্রগামী নেতাই কংগ্রেসে যান নাই বা যাইতে পান নাই, সেই কয়বৎসর চিত্তরঞ্জনকে কংগ্রেস-মণ্ডপে অনুপস্থিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার বা অভিযোগ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। যে দলের যে মতের রাজনৈতিক তিনি ছিলেন সেই দলকে সেই মতকে তিনি পরিত্যাগ করিলেই ১৯০৭ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর তিনদিন, প্রতিদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য নিশ্চয়ই তিনি কংগ্রেসের বৈঠকে আসিবার এবং সম্মানের সহিত পাখার নীচে উচ্চ আসনে বসিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেন। তাহা তিনি করেন নাই, কেননা এই কয়বৎসর চিত্তরঞ্জন তাঁহার রাজনৈতিক দল ও মতকে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত একমনে একপ্রাণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। এমনকি অন্যান্য স্বদেশী-নেতার মত বিপদের মুহূর্ত্তে জ্ঞানহারা হইয়া তাঁহার মুখে বিলাপ অথবা প্রলাপ আমরা শুনি নাই। তিনি 'বাসুদেব' দেখেন নাই, ছান্দোগ্য-উপনিষদের স্বরাজ বলেন নাই।

চিত্তরঞ্জনের পক্ষে এই কয়বৎসর কংগ্রেসের নামে 'মডারেট কনভেনশান' বা 'মেটা-মজলিসে' নিয়মিতরূপে হাজীরা না দিবার আর এক কৈফিয়ৎ আছে, এবং তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৈফিয়ৎ। স্বদেশী যাঁহারা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার শেষরক্ষা না করিয়াই, বিংশ-

শতাব্দীতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুনরভিনয় করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন সংবাদ মিথ্যা হউক, ঐতিহাসিক তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু যদি তাহা সত্য হইত, তাহা হইলে একজন একচ্ছত্রী স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন নরপতির সিংহাসন হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পলায়ন অপেক্ষা, বিংশ শতাব্দীতে প্রজাতন্ত্র-মূলক শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা কল্পে উদ্‌যোগী মহাপুরুষদের পলায়ন নিতান্তই কাপুরুষের মত, তুলনায় অধিকতর নিন্দনীয়। লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী পরিত্যাগের কোন গুরুতর রাজনৈতিক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু স্বদেশী-নেতাদের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে পলায়নের কোন রাজনৈতিক হেতু নাই, যাহা আছে তাহা এক অতি নির্লজ্জ আচম্‌কা আধ্যাত্মিক কারণ। মানুষ বিপদে পড়িয়া এত সহসা রাজনীতি ছাড়িয়া ধার্ম্মিক হইয়া উঠে, ইহা বোধ হয় বাঙ্গলা ছাড়া আর কুত্রাপি কোন দেশের ইতিহাসে দেখা যাইবে না। স্বদেশী-নেতাগণ শেষরক্ষা করিতে না পারিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে হয় তাঁহারা আত্মহত্যা করিলেন, না হয় তাঁহাদের অপঘাত মৃত্যু হইল। রাজশক্তি সুযোগ বুঝিয়া রক্তনেত্র বিস্ফারিত করিল, দমননীতি সফলতা লাভ করিল। সেই দুর্য্যোগে, সেই দুর্দ্দিনে, সেই রাজদ্রোহিতা ও তাহার দমননীতি এই দুই বিপরীত ঝড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া যে শক্তিশালী মহাপুরুষ একা সব্যসাচীর মত দেশের প্রাণ ও

মান রক্ষা করিয়াছেন, স্বদেশী-আন্দোলনের ইতিহাসে এখনও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান আমরা নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারি নাই। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে কংগ্রেস ছিল না। কংগ্রেসের নামে মডারেটদলের একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচার ছিল। চিত্তরঞ্জন যে সেই সময় কংগ্রেস-বৈঠকে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ বাঙ্গলায় তথা ভারতবর্ষে তখন দ্বিতীয় চিত্তরঞ্জন ছিল না। মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর তাঁহাকে যেরূপ এইকালের মধ্যেই রাজদ্রোহ মামলায় ভারত-বাসীর পক্ষসমর্থনের জন্য নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মডারেট কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার অপেক্ষা আরও গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করা যায়। এই অভিযোগ রাজনৈতিক নহে, পরিবারিক। এই কালের মধ্যে বহু সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিতও সাক্ষাৎ করিবার কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

সুরাট কংগ্রেসে জাতীয়-দলের অবমাননার পর হইতে দ্বাদশবৎসর চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস-মণ্ডপে যাওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। এই দ্বাদশবৎসর জাতীয়-দলের রাজনীতি কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া রাজদ্বারে, কারাগৃহে ও বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত সেবা-ধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে যে স্থানে, যে যে কেন্দ্রে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে ও সেই সেই কেন্দ্রে এই দ্বাদশবৎসর নিয়তই

আমরা চিত্তরঞ্জনকে দেখিতে পাইয়াছি। ধর্ম্ম এবং সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনি স্বদেশীর কোন নেতা অপেক্ষাই কম নহেন। অথচ দেশের রাজনৈতিক বিপদের দিনে আমরা অযথা তাঁহাকে নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া নিরাপদে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে দেখি নাই। স্বদেশী-মন্থনের কালে যে বিষ উত্থিত হইয়াছিল, সেই বিষ পান করিবার জন্য এই এক নীলকণ্ঠকে রাখিয়া আর যত সব ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ একে একে নিজ নিজ ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই নীলকণ্ঠ সেদিন একলা স্বদেশী-মন্থনের সমস্ত বিষ অঞ্জলী ভরিয়া আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। তিনি না থাকিলে আজ কে জানে, অরবিন্দ বারীন্দ্র কোথায় কি ভাবে থাকিতেন? যদিও অরবিন্দ ও বারীন্দ্র রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তো প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। তিনি না থাকিলে কত নির্দ্দোষী আজ কোথায় থাকিত, কে জানে? তিনি না থাকিলে অন্তরীনে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের কত শত বিপন্ন পরিবার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কোথায় বিলুপ্ত হইত তাই বা কে জানে? এবং পরিশেষে ইহাই মনে হয় যে, যে প্রতিভাবলে ইংরাজ-বিচারালয়ে রাজদ্রোহিতা আইনের যেরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন, সেই প্রতিভা উপযুক্ত সময়ে কার্য্য না করিলে হয়তো কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের আইনের আবরণে দমন-নীতি ক্রমশঃ অন্যান্য কারণের সহিত মিলাইয়া এত সহজে শিথিল করিতেন না। ১৯০৬এর পর

হইতে দ্বাদশ বৎসর কংগ্রেসে না যাইবার যে কৈফিয়ৎ জাতীয়দলের নেতাদের আছে, তাহা ছাড়া চিত্তরঞ্জনের আরও অধিকতর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎও আছে, যাহা অবশ্য অন্য নেতাদিগের ছিল না এবং নাই। সুতরাং ১৯০৬এর পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক অন্ধ না হইলে এই যোগসূত্র অতি স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইবেন।

স্বদেশীর জাতীয়দল যে বহু বৎসর কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত ছিলেন তাহার আরও কারণ যে লোকমান্য তিলক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে দীর্ঘ ছয় বৎসর রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত ছিলেন। কেশরী পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল, কাজেই অন্যান্য বন্য জন্তুগণ তাঁহার অভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও পলায়ন ভিন্ন আর বিশেষ গুরুতর কিছু করিবার ভরসা পায় নাই। কেশরী পিঞ্জর ছাড়িয়া বাহিরে আসার পরের বৎসরই লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে জাতীয়দলের পুনঃ প্রবেশের সূত্রপাত হয়। তিলকের আবির্ভাবের পর হইতেই বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন পুনরায় দেখা দেন। যে সময়ে লোকমান্য তিলক কারামুক্ত হইয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিলেন সেই সময়েই মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার জীবনের প্রাথমিক অধ্যায় শেষ করিয়া তাহার পরের অধ্যায়ের জন্য ভারতবর্ষে

অবতীর্ণ হইলেন। এই মণি-কাঞ্চন সংযোগে যে দ্যুতি রাজনৈতিক আকাশে ফুটিয়া উঠিল, আজ আমরা সেই রোশনাইএ পথ করিয়া লইয়াছি। সকল দিক পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, ১৯০৬এর চিত্তরঞ্জন হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের চিত্তরঞ্জন ভিন্ন নহে।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ তুলনা করিবার এখনো সময় উপস্থিত হয় নাই, তবে এই দুই মহাপুরুষ একই সময়ে একই উদ্দেশ্য দ্বারা এক রাজনৈতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রায় একই সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বাঙ্গলা যে সময়ে বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী শাসন বয়কট করিবার প্রস্তাব করিতেছিল, বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন যখন বাঙ্গলার সেই সুরে সুর মিলাইতেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-অস্ত্র প্রজার পক্ষ হইতে গ্রহণ ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছিলেন। বাঙ্গলার স্বদেশী-আন্দোলন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-আন্দোলন একই যুগের একই সময়ের আন্দোলন। কিন্তু এই দুই আন্দোলনের সাদৃশ্য অপেক্ষা ইহাদের প্রকৃতি-গত পার্থক্যও খুব গুরুতর। বাঙ্গলার স্বদেশী ও দক্ষিণ-আফ্রিকার নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-আন্দোলনের মূল আদর্শে কিছু পার্থক্য তো ছিলই, এই দুই আন্দোলনের অবলম্বিত উপায়ের মধ্যেও গুরুতর পার্থক্য ছিল। স্বদেশী-আন্দোলনে বাঙ্গলায়

বিপিনচন্দ্রের মত উগ্র হিংস্র তীব্র জ্বালাময়ী-ভাষা-উদ্গীরণ-কারী বাক্‌বিভূতি-সম্পন্ন, অদ্ভুতক্ষমতাশালী 'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু ও সাহসে দুর্জ্জয়' নেতা ছিলেন এবং বারীন্দ্রের মত জীবনমরণতুচ্ছকারী অবৈধ উপায়ে গুপ্তহত্যা করিয়া দেশোদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর দুঃসাহসী বালকও ছিল। বাঙ্গলার স্বদেশী-আন্দোলনে একদিকে ছিল অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অন্যদিকে ছিল অদ্ভুত বালকোচিত দুঃসাহস। দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের মধ্যে বাঙ্গলার এই বাগ্মিতা ও বোমা এ দু-এরই অবসর ছিল না। কিন্তু বাঙ্গলায় যাহা ছিল না, মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাহা ছিল। মহাত্মা গান্ধী শুধু নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—তিনি তত্ত্বের সহিত সাধনাকে মিশ্রিত করিয়াছেন, কথার অনুপাতে কার্য্য করিয়াছেন। যে সময়ে মহাত্মা গান্ধী নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-মন্ত্রের সাধক হইয়া পুনঃ পুনঃ দক্ষিণ-আফ্রিকায় সংযত ভাবে অবৈধ আইন ভঙ্গ করিয়া পুনঃ পুনঃ কারাক্লেশ সহ্য করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙ্গলায় স্বদেশী-আন্দোলনের বক্তৃতা প্রায় থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বোমাঘটিত গুপ্ত রাজদ্রোহীদলের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তথাকথিত রাজদ্রোহীদের বিপন্ন রাখিয়া বিচারালয় পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যে সময়ে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস ছাড়িয়া ইংরেজের বিচারালয়ে উপস্থিত, সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীও পুনঃ পুনঃ ইংরাজ

বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া উপস্থিত। এই দুই নেতার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায় ইংরেজের বিচারালয়ে অতিবাহিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যে ভাবে ইংরেজের অবৈধ আইনকে প্রতিবাদ করিয়াছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সে ভাবে ইংরেজের অবৈধ আইনকে প্রতিবাদ করেন নাই। পার্থক্য এইখানে এবং ইহা গুরুতর পার্থক্য।

মহাত্মা গান্ধী গবর্ণমেণ্টের অবৈধ আইনকে বলিয়া কহিয়া, গবর্ণমেণ্টকে ঐ আইন পরিবর্ত্তন করিবার যথেষ্ট অবসর দিয়া পরে মুখের উপর স্পষ্ট সোজাসুজী ভাবে ঐ আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আইন ভঙ্গের একটা বিশেষত্ব এই যে তিনি উপদ্রব না করিয়া (Non-violent) আইন ভঙ্গ করেন। আততায়ীকে তিনি আক্রমণ করেন না, এমন কি হিংসাও করেন না, শুধু গুরুতর কর্ত্তব্যবোধে বাধ্য হইয়া শান্ত ও সংযত ভাবে মুখে মৃদুতা ও অন্তরে বজ্রের দৃঢ়তা লইয়া আইন ভঙ্গ করেন। আইন ভঙ্গ করিবার আইন অমান্য করিবার এই যে বিশেষ উপায় ইহা বর্ত্তমান যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীর নূতন আবিষ্কার। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার, জড়-জগতে এই দুইটী স্থূল আবিষ্কারের সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা, গান্ধীর নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধের তুলনা হইতে পারে। আবিষ্কার অর্থ নূতন কিছু গড়া নহে, যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে তাহাকে অজ্ঞানের রাজ্য হইতে জ্ঞানের রাজ্যে

আনা, অন্ধকার হইতে আলোকে বাহির করা। আমেরিকা ছিল, কলম্বসের পূর্ব্বে কেহ জানিত না; মাধ্যাকর্ষণ ছিল, নিউটনের পূর্ব্বে কেহ জানিত না; প্রজাশক্তির স্বাধীনতার জন্য হিংসা ও হত্যা ছাড়া অহিংস অসহযোগনীতি বা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-নীতি ছিল, মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব্বে কেহ তাহা জানে নাই। জড় ও বৈজ্ঞানিক জগতে কলম্বস ও নিউটনের যে স্থান, রাজনৈতিক জগতে, কেবল ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধীর স্থান ইহাদের নীচে হইবে না।

যাহা হউক, গুপ্তরাজবিদ্রোহের দ্বারাও সম্ভব নয়, প্রকাশ্য বিদ্রোহও অসম্ভব, কংগ্রেসের মামুলী ক্রন্দনও ব্যর্থ, অতএব এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে প্রজাশক্তির পক্ষে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের অন্বেষণে কোন মহাপ্রাণ জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। বাঙ্গলায় স্বদেশীযুগে বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠে এই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের একটা সংবাদ যে আমরা না পাইয়াছিলাম তাহা নয়, কিন্তু জাতির জন্য সেই অস্ত্র তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা তথা ভারতের বাহিরে মহাত্মা ১৯০৬ হইতেই এই অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিলেন, একলব্যের মত তিনি দৃঢ় নিষ্ঠায় অচলা ভক্তিতে তপস্যা করিতেছিলেন। তপস্যায় দেবতার আসন টলিয়াছিল, তিনি বরলাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্র নিজের হাতে লাভ করিয়াছিলেন। সেই নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-অস্ত্র দক্ষিণ-

আফ্রিকায় ভারতীয় প্রজার পক্ষ হইতে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, শত্রু পরাজিত হইয়াছিল। যে দিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-অস্ত্র অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিল, সে দিন—সেই দিন ভারতের পূর্ব্বাকাশে স্বাধীনতা-সূর্য্যের তরুণ-রশ্মি দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় জয় করিয়াছিলেন। যে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-অস্ত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর মান ও ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, আজ তাহাই ভারতবর্ষে আনীত হইয়া দীর্ঘ পাঁচবৎসর ব্যাপিয়া সেই অসীম শক্তিশালী মহাপুরুষ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহার ফল ভবিষ্যতের ইতিহাস—আমরা ভবিষ্যদ্বক্তা নহি, আমরা এই যুদ্ধের ফলাফল এখনই জানিতে পারি না এবং না জানিয়া বলিবারও স্পর্দ্ধা রাখি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বদেশীযুগের অবসান হইতেই মনীষী চিত্তরঞ্জন যখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের তিনটী উপায়ের বিষয় চিন্তা করিয়া হতাশে ম্রিয়মান হইতেছিলেন, তখন, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত মহিমাময় পূত পবিত্র অহিংসামূলক নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-রূপ গাণ্ডীবধনু হস্তে ভারত-বক্ষে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সত্যাগ্রহ ও

তাহার পরিণতিস্বরূপ নন-কো-অপারেশান আন্দোলন ও এমন কি Civil Disobedience আন্দোলন পর্য্যন্ত আজ দেখা দিয়াছে, ইহা বাঙ্গলার স্বদেশী-আন্দোলনের রকমফের এডিসন বা সংস্করণ নহে, ইহা স্বদেশী-আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় নহে, ইহা দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশী-আন্দোলনের সমসাময়িক মহাত্মা গান্ধীর যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন —সেই আন্দোলন। ইচ্ছা হইলে বলিতে পার, ইহা সেই দক্ষিণ-আফ্রিকার নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ আন্দোলনের স্থান কাল ও পাত্রভেদে দ্বিতীয় অধ্যায়। তবে একথা অস্বীকার করিলেও চলিবে না যে, বাঙ্গলার স্বদেশী-আন্দোলন এই আন্দোলনকে গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বহু পরিমাণে দেশকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ যে এই আন্দোলন নির্ব্বিচারে ও বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইতেছে না বাঙ্গলার স্বদেশী-আন্দোলনও তাহার একটী কারণ। কেননা, এই শ্রেণীর আন্দোলনের ভ্রম ও ত্রুটী আমাদের অভিজ্ঞতায় ও স্মৃতিতে জাগ্রত রহিয়াছে।

মারাঠী তিলক ও গুজ্‌রাটী গান্ধী যখন বিধির বিধানে সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সহসা একসঙ্গে আসিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবক্ষে মিলিত হইলেন এবং এই মিলন হইতে যে আন্দোলন অন্তরীক্ষে নীহারিকার আবর্ত্তনের মত ঘুরিতে আরম্ভ করিল, সেই মহাঘূর্ণীপাকে, সেই বিরাট অভূতপূর্ব্ব অচিন্ত্যনীয় নব-উদ্বোধিত প্রজাশক্তির পীঠ-ভূমিতে

আসিয়া মিলিত হইবার জন্য ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক নেতার প্রতি আদেশ হইল,—ওঠ, জাগো, আসিয়া মিলিত হও। মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন কাণ পাতিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসে নাই, বাঙ্গলার আজিকার শ্রেষ্ঠ-বীর কখনও অস্ত্র ত্যাগ করিয়া কোমল উপাধানে মস্তক রাখিয়া অলস-শয্যায় দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জীবনের দিন কাটান নাই। এই মহাবীর অস্ত্রে ও বর্ম্মে সর্ব্বদাই সুসজ্জিত ছিলেন। তিনি এই দ্বাদশ বৎসর কর্ম্মভূমির অন্বেষণ করিয়াছেন, আদেশের অপেক্ষা করিয়াছেন। আদেশ, যখনই আসিয়াছে, তখনই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। আদেশ অমান্য করিবার অধিকার তাঁহার নাই। যদি এই আদেশ গুজরাটী গান্ধীর মধ্য দিয়াই আসিয়া থাকে, তথাপি ইহা আদেশ—যাহা আদেশ, তাহা পালন করিতে হইবে, তাহার বিচার সম্ভব নয়। তথাপি ভারতবাসী এই আদেশের বিচার করিয়াছে। চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার পক্ষ হইতে শুধু বিচার নয়, ইহার প্রতিবাদও করিয়াছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে একের পর আর অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে চিত্তরঞ্জন নির্ব্বিচারে বিনা প্রতিবাদে এই আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করেন নাই, তিনি সন্দেহ করিয়াছেন, প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার মত প্রতিবাদ আর কেহই করে নাই, করিবার স্পর্দ্ধাও রাখিত না। কিন্তু তিনি যাহা বলিবার, যাহা আপত্তি করিবার তাহা বলিয়াছেন ও

করিয়াছেন এবং তাঁহার সন্দেহ-ভঞ্জন হইয়াছে বলিয়াই এখন তিনি মহাত্মার সহিত দেশবন্ধুরূপে সুর মিলাইয়া অন্ততঃ বাঙ্গলার ইজ্জত বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিতেছেন। এই বিরাট আন্দোলনকে আজিকার এই মনুষ্যহীন বাঙ্গলা চিত্তরঞ্জনকেই উপঢৌকন দিয়াছে। আজ চিত্তরঞ্জন না থাকিলে, গান্ধীর সন্মুখে, ভারতের সন্মুখে তথা জগতের সন্মুখে আমরা বাঙ্গালী কোথায় থাকিতাম? [চিত্তরঞ্জন ছিল বলিয়াই, আমরা বাঙ্গালী আজ আছি বলিতে পারি। চণ্ডীদাসের কাব্য, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লইয়া যে পরদুঃখ-কাতর, দয়ার-সাগর মহাপ্রাণ বাঙ্গালী প্রাণ-ধর্ম্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণকল্পে সাহিত্যে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন, আজ দেখিতেছি তাহা ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গলার প্রাণ-ধর্ম্ম মরে নাই। বাঙ্গালী মরে না, প্রাণ দেয়, চিত্তরঞ্জন তাহার প্রমাণ।] যখন এই আন্দোলন ধীরে ধীরে জাগিতে লাগিল, তখন হইতেই চিত্তরঞ্জন ইহার সহিত প্রাণের সুর মিলাইতে লাগিলেন। এই অ-সহযোগ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ে আমরা সত্যাগ্রহ দেখিতে পাই। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পরই আমরা চিত্তরঞ্জনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। সত্যাগ্রহের দিনকে চিত্তরঞ্জন 'গান্ধীর দিন' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা 'নারায়ণের' বক্ষে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তিনি সত্যাগ্রহ-ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হইলেন। ময়মনসিংহে তিনি নিজেকে সত্যাগ্রহী বলিয়া পরিচয় দিলেন।

এই আন্দোলনকে গান্ধীর আন্দোলন বলিয়া ঘোষণা করিতে ও স্বীকার করিতে স্ত্রীলোকের মত কলহও করেন নাই। এই সত্যাগ্রহ ব্রত ভারতবাসী নির্ব্বিবাদে উদ্‌যাপন করিতে পারেন নাই। পাঞ্জাবে সত্যাগ্রহ লইয়া আমলাতন্ত্রের সহিত বিরোধ ভারতের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল—ক্রমে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে অঘটন ঘটিল তাহাতে ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি প্রজাশক্তির শেষ শ্রদ্ধাটুকুও আর থাকিল না। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যভাগে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা—নিরস্ত্র নির্দ্দোষী বালকবালিকাপূর্ণ শান্ত সংযত জনতার উপর তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া নির্ম্মম ও নৃশংস হত্যা—এই আন্দোলনের গতিকে একটু অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলন—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর হইতে ক্রমে বর্ত্তমান অ-সহযোগ আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমান ভ্রাতাদিগের খিলাফৎ-সমস্যা মীমাংসার ভার যখন মহাত্মা গান্ধী হিন্দুর প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিলেন, তখন ভারতের ইতিহাসে সহস্র বৎসরের একটী অধ্যায় সম্পুর্ণরূপে নিঃশেষ হইল। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রাণতায় যেরূপ ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইল, তাহা হইতে আর এক নূতন যুগ, নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। স্বদেশী-আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন হইলেও মুসলমান ভ্রাতারা উহাতে যোগ দেন নাই, সুতরাং উহা এক সাম্প্রদায়িক

হিন্দু-আন্দোলনে নিঃশেষ হইয়াছে। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন, প্রধানতঃ ধর্ম্মের আন্দোলন হইলেও ইহা কেবল মুসলমানের আন্দোলন নহে ; ইহা মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন, ইহা হিন্দুর আন্দোলনও বটে। সুতরাং ইহা কেবল একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ভবিষ্যত কেবল ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। চিত্তরঞ্জন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর সহিত একসঙ্গে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া একই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মিলিত মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আমলাতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল নহে। খিলাফৎ-আন্দোলনেও চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী।

ইহার পরেই অ-সহযোগ আন্দোলন। কংগ্রেসী-বৈঠকে তাহার আলোচনা, প্রতিবাদ ও তৎসম্পর্কে সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন ও গ্রহণ—ইহা ইতিহাস। এই অ-সহযোগ আন্দোলনের উপায় লইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত চিত্তরঞ্জনের মতের অনৈক্য বেশ স্পষ্টরূপে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার লজপতী-কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব এত অধিক অনুভব করা গেল যে মহাত্মা গান্ধী যদি ইচ্ছা করেন তবে অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া তিনি নিজের ইচ্ছাকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য অপ্রতিহত ক্ষমতায় পরিচালিত করিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী গুজরাটী বৈষ্ণব এবং অতি

বিনয়ী মানুষ। অন্যের ইচ্ছাকে অন্যায়রূপে দমন করিয়া এবং আরও অনেকের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল এক স্বতন্ত্র পৃথক নিজের ইচ্ছাকে চালনা করিবার শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি তাহা করেন নাই। এইখানে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সংযম ও নিয়মতন্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ভারতের ভবিষ্যত কল্যাণের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক মমত্ববোধ একসঙ্গে দেখা দিয়াছে। গান্ধিজী স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ পাইয়াও স্বেচ্ছাচারী নহেন। ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্র গান্ধিজীর চরিত্রের এইদিক অনুকরণ করিতে পারিলে ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়েরই উপকার হইত। কিন্তু আমলাতন্ত্র গান্ধিজীর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন নাই। কলিকাতার গান্ধী-প্রভাবান্বিত লজপতী-কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন, গান্ধীর সহিত মূল উদ্দেশ্যে একমত হইয়াও উপায় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেদিন ইহা শুধু তাঁহার একার ব্যক্তিগত মত বলিয়া প্রচার করেন নাই, সম্ভবতঃ ইহা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত মতও ছিল না। চিত্তরঞ্জনের মন্ত্রণাগৃহে তখন যে রাজনৈতিক বৈঠক বৈষ্ণবের অষ্ট-প্রহরের মত অহোরাত্র চলিত, কে জানে চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে সেই বৈঠকের মতামত একটু অধিক পরিমাণে ধ্বনিত হইয়াছিল কি না? যদি তাহা হইয়াই থাকে এবং হওয়া সম্ভব, তাহা হইলে গণতন্ত্রমূলক আদর্শের অনুপাতে চিত্তরঞ্জন উপায়

নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইয়া প্রশংসার কার্য্যই করিয়াছেন। আর ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে উপায় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে গান্ধীর প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত।

মহাত্মা গান্ধী অ-সহযোগ আন্দোলনের উপায় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল একটা নিষেধাত্মক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই অ-সহযোগকে একের পর আর কয়েকটী স্তরে বিভক্ত করিয়াছিলেন ও এক স্তরের পরে অন্য স্তরে কার্য্য করিয়া জাতিকে তাহার পরের স্তরে কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এক সঙ্গে সমস্ত স্তরের কার্য্য আরম্ভ করা সমীচীন বোধ করেন নাই। চিত্তরঞ্জন এই উপায় সম্বন্ধে বাঙ্গলার পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ অ-সহযোগ আন্দোলনের উপায়কে তিনি কেবল এক নিষেধাত্মক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা নিরাপদ মনে করেন নাই। ছাত্রেরা ইংরাজের স্কুল ছাড়ুক ইহা মহাত্মা গান্ধীর সহিত চিত্তরঞ্জনেরও অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু তিনি ছাত্রদের ইংরাজের স্কুল পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। ইংরাজের আদালত পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার মত একজন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনশীল ব্যবহারজীবীও পরামর্শ দিয়াছিলেন,

কিন্তু সেই সঙ্গে জাতীয় সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠার একটা প্রয়োজনবোধও করিয়াছিলেন। কখনও কখনও চিত্তরঞ্জনের কথা হইতে আমরা এমনও বুঝিয়াছি যে নিজেদের জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করার পূর্ব্বে ইংরাজের বিদ্যালয় ও বিচারালয় পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না এবং ইহা করিলে পরিণামে কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে। মহাত্মা গান্ধী যেরূপ শিক্ষা ও বিচার সম্বন্ধে ইংরাজ আমলাতন্ত্রের সংশ্রব পরিত্যাগ করার উপরই জোর দিতেছিলেন এবং নিজেদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনের পূর্ব্বেই ছাত্র ও ব্যবহারজীবীদিগকে আমলাতন্ত্রের সংশ্রব হইতে সরাইয়া আনিবার জন্য জোর তাগাদা দিতেছিলেন, চিত্তরঞ্জন যে কোন কারণেই হউক, তাহা খুব সমীচীন এবং জাতির পক্ষে নিরাপদ মনে করিতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন, ছাত্রগণ ও উকীলগণ তোমরা চলিয়া আইস, তোমাদের চলিয়া আসাটাই সম্প্রতি প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। ছাত্র যদি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া কিছুদিন বসিয়া থাকে থাকুক, উকীলগণ আদালত ছাড়িয়া আসিয়া যদি কিছুদিন বেকার বসিয়া থাকে থাকুক, আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় সালিশী আদালত যদি ইহাদের ছাড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠে উঠুক আপত্তি নাই, আর যদি নাই গড়িয়া উঠে তাহা হইলে এখনই তাহার জন্য তাড়াতাড়ি করিবার কোন

প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিতে গেলে যে সময়, শক্তি ও অর্থের প্রয়োজন তাহা অন্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে স্বরাজের পথে অধিক অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা; এবং মহাত্মা গান্ধীর মতে জাতির সময়, শক্তি ও অর্থ জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশী আদালত গড়া অপেক্ষা অন্য অধিকতর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। তথাপি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশী আদালতের প্রতিষ্ঠাকল্পে সম্মতি দিয়াছিলেন, ইহা কেবল চিত্তরঞ্জন প্রমুখ অন্যান্য নেতাদিগের সহিত পরামর্শের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশী আদালতের প্রলোভন দেখাইয়া কতিপয় ছাত্র ও কতিপয় উকীলকে তাহাদের অভ্যস্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া কথানুযায়ী কার্য্য করিতে না পারায় যে কুফল ফলিয়াছে, গান্ধী তাহার জন্য অনুতাপ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশী আদালতের প্রলোভন না দেখানই উচিত ছিল। অ-সহযোগীরা ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন, প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়া তাঁহাদের যোগ্য কার্য্য নহে। চিত্তরঞ্জনের আশা ও কল্পনা অনুযায়ী জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশী আদালত পূর্ণ রকমে গড়িয়া উঠে নাই। যদিও চিত্তরঞ্জনের পরামর্শের মধ্যে আমরা একটা সতর্ক পদবিক্ষেপ দেখিতে পাই এবং সকলদিক বিবেচনা করিলে ইহা সুপরামর্শ বলিয়াও মনে করিতে পারি, তথাপি কার্য্যতঃ যে ইহা হইয়া

উঠে নাই, এজন্য মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীর প্রাথমিক নিষেধাত্মক ভিত্তি অধিকতর কার্য্যকরী ছিল। যাহা আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় করিয়া উঠিতে পারিব না তাহা যতই উত্তম হউক, করিবার জন্য একটা বৃথা এবং নিষ্ফল আকাশ-কুসুম রচনা করিলে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইবে।

প্রথম হইতেই মহাত্মা গান্ধী অ-সহযোগ রূপ অস্ত্র প্রয়োগে একটা বিশেষ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অ-সহযোগের যে কয়টী স্তর বাছাই করা হইয়াছে তাহা একটীর পর আর একটী ক্রমে অবলম্বন করিতে হইবে ইহাই মহাত্মার অভিমত। স্তর বিন্যাসে পরে পরে এক স্তর অন্য স্তর হইতে কঠিন। প্রথম স্তর সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কম বিরক্তিজনক, শেষস্তর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অশেষ বিপত্তিজনক। মহাত্মা গান্ধী অ-সহযোগ ব্রত অবলম্বন পথে আমাদিগকে উপাধিত্যাগ রূপ প্রথম স্তর হইতে Civil disobedienceরূপ শেষ স্তরে পৌঁছিবার আদেশ দিয়াছেন এবং নিজেও উহা অগ্রগামী হইয়া আচরণ করিয়া নেতৃত্বের মহাদায়িত্ব পালন করিতেছেন। অ-সহযোগের পথে এই একের পর আর স্তরভেদ প্রণালী লইয়া কথা উঠিয়াছিল, চিত্তরঞ্জন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতার লজপতী-কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া নাগপুরের বিজয়রাঘব চারিয়ারী-কংগ্রেস পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর

প্রভাব কংগ্রেসের উপর যেমন অত্যন্ত অধিক অনুভূত হইতেছিল, অন্য দিকে সেইরূপ গান্ধী-নির্দ্দিষ্ট স্তরভেদ প্রণালীর প্রতিবাদও চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে, বিশেষ ভাবে তাঁহার ঢাকা ও কলিকাতার বক্তৃতায় স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তখন চিত্তরঞ্জনের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে স্বরাজ লাভের সময় এক বৎসর না হইয়া পাঁচ বৎসর হউক, এবং এখনি নন্-কো-অপারেশান-নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য কোন এক স্তরেও অবলম্বন করিয়া কাজ নাই, এখন হইতে পাঁচ বৎসর কেবল সাধনা করিতে হইবে। সমগ্র জাতিকে সহসা একদিন সমস্ত স্তরে ও বিভাগে একসঙ্গে নন্-কো-অপারেশান অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। অসহযোগের স্তরগুলি একের পর আর অবলম্বন করা হউক, ইহাই মহাত্মা গান্ধীর অভিমত। চিত্তরঞ্জন বলিলেন, এই স্তরগুলি সহসা একদিন সমস্ত জাতি অবলম্বন করুক এবং সেইদিন এখন হইতে পাঁচ বৎসর পরে হউক। মহাত্মা বলিলেন, না সেদিন আজই উপস্থিত। আর অপেক্ষা করা চলিবে না, প্রাথমিক স্তর এখনি অবলম্বন করিতে হইবে। এই সূক্ষ্ম মতভেদ লইয়া মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের কিছুদিন আলোচনা চলিয়াছিল। তাহার পর চিত্তরঞ্জন নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও অধিকাংশ সহকর্ম্মিগণের অনুমোদিত একের পর আর স্তরভেদ প্রণালী অবলম্বন করিলেন, এবং এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভের জন্য

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ভাব-মাধুর্য্যের ললিত-নৃত্যগতি এইরূপ প্রচণ্ড শিব-তাণ্ডবে পরিণত হইবে, নিত্যবৃন্দাবনের যমুনাপুলিনে এই চিরন্তন কিশোর বালকের সুললিত বাঁশরী এইরূপে মহাতাণ্ডবের নৃত্যচ্ছন্দে প্রলয়ের পূর্ব্বাভাষ ঘোষণা করিয়া ঈশানের বিষাণরূপে বাজিয়া উঠিবে, বাঙ্গালী ও গুজরাটী বৈষ্ণব একসঙ্গে একই সুরে সুর মিলাইয়া একই তালে পা' ফেলিয়া এমনি করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস আবার একবার ভাঙ্গিয়া গড়িবে, ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে কে কল্পনা করিয়াছিল?

মহাত্মা গান্ধী-নির্দ্দিষ্ট অসহযোগের একের পর আর স্তরভেদ প্রণালীর যে স্পষ্ট প্রতিবাদ চিত্তরঞ্জন একদিন জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, আজ তাহার গুরুত্ব বুঝিবার অবসর হইবে না জানি। কিন্তু আজের পরও দিন আসিবে, দিনের পর দিন আসিতেছে, ইতিহাসের উপাদান ক্রমে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। এই ইতিহাস যিনি লিখিবেন, চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদ বিশ্লেষণের দোষগুণ তিনিই বিচার করিবেন; এখনি পথের মাঝে দাঁড়াইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে আমরা অনেক দূর দেখিতে পাইতেছি না। আমরা চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদ এই মুহূর্ত্তে সুক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না, তবে আমাদের যাহা মনে হয় তাহা এই যে, চিত্তরঞ্জন ভাবিয়াছিলেন, এখন হইতেই অ-সহযোগের কোন স্তরে কার্য্য আরম্ভ করিলে কর্ত্তৃপক্ষ এমন বিঘ্ন উপস্থিত করিবে যে, আমরা

আর দ্বিতীয় স্তরের কথা কল্পনাতেও আনিতে পারিব না। এবং যথেষ্ট রূপে একতাবদ্ধ দৃঢ় ও সংযত না হইয়া তাড়াতাড়ি প্রথম স্তর হইতে এখনি কার্য্য আরম্ভ করিলে প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রবল রাজ-অত্যাচার আসিয়া সমস্ত আন্দোলনটী কিছু দিনের জন্য একেবারে নিভাইয়া দিতে পারে। এক স্তরে বিফল মনোরথ হইলে তাহার পরবর্ত্তী স্তরে কার্য্যকরা অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং প্রথম দুই এক স্তরে বিফল হইলে অন্যান্য স্তরগুলিকে শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বন না করিয়াই নন্‌-কো-অপারেশানের ভূমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। মনীষী চিত্তরঞ্জনের এই সম্পর্কে আরও দুইটী অভিপ্রায় ছিল বলিয়া আমরা তাঁহার ভাব ও ভঙ্গীতে অনুমান করিতে পারি। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন, এই অ-সহযোগ-ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য এতবড় একটা বিশাল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জাতি বুঝিবা এখনো সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি কিছুদিন সময় চাহিয়াছিলেন এবং এই সাধন সময়ের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কোন প্রকার কলহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এবং ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে ক্রমে ক্রমে স্তরভেদ করা অপেক্ষা সহসা একদিন সমগ্র-জাতি একসঙ্গে এক মনে এক প্রাণে আমলাতন্ত্রের শাসন কার্য্যের সমস্ত বিভাগে ধর্ম্মঘট করিয়া বসিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিনারক্তপাতেই আমাদের স্বরাজ লাভ

হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মত রক্ষা করেন নাই, কেন করেন নাই তাহারও অবশ্য কারণ আছে। সম্ভবতঃ তিনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে গান্ধীর সহিত বিরোধ না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়াই অধিকতর সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। কেননা, ভারতবর্ষে গান্ধী এখন এক এবং অদ্বিতীয়। আসমুদ্র হিমাচল এই দুর্ব্বলদেহ কৃশ মনুষ্যটীর বাম হস্তের তর্জ্জনী হেলনে পরিচালিত হইতেছে। ব্রিটিশ-যুগে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে এমন কখনও হয় নাই, সুতরাং ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর যে অপ্রতিহত প্রভাব তাহা ইতিহাসে একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। জনসাধারণের উপর এই প্রভাব অপ্রতিহত রাখিয়া, এই প্রভাবের বলে ও কৌশলে জাতি স্বরাজের পথে বিনা রক্তপাতে যে পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইতে পারে তাহা জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চিত্তরঞ্জন করিতে ইচ্ছুক। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবকে অপ্রতিহত রাখিবার সম্ভবতঃ ইহাও একটী কারণ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদ মহাত্মা গান্ধী ধীরভাবে শ্রবণ করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদের ফলে অ-সহযোগ আন্দোলনের প্রাথমিক নিষেধাত্মক ভূমিও তিনি আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে নিষেধাত্মক ভূমি পরিবর্ত্তনের ফলে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। জাতীয়

বিদ্যালয় ও সালিশী আদালত আশানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই। জাতি গড়িয়া না উঠিলে বোধ হয় তৎসংক্রান্ত বিদ্যালয় ও বিচারালয় গবর্ণমেণ্টের সংশ্রব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহজে ও অবাধে গড়িয়া উঠিতে পারে না, একথা আমরা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদের ফলে তাঁহার নন্-কো-অপারেশানের একের পর আর স্তরভেদ-প্রণালী পরিত্যাগ করেন নাই। সহজ হইতে কঠিন, কঠিন হইতে অধিকতর কঠিন—নন্-কো-অপারেশানের এই কৌশলপূর্ণ স্তরবিন্যাস, তাহা তিনি চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাহাল রাখিয়াছেন, অবলম্বন করিয়াছেন ও ভারত-বাসীকে ইহা একের পর আর অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং যে পদ্ধতি অনুসারে ভারতবাসী এই নন্-কো-অপারেশান উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধী নিজের স্কন্ধে লইয়াছেন। ইতিহাস এই মহাদায়িত্বের গুরুত্ব একদিন বিচার করিয়া দেখিবে, আজ তাহা বিচার করিবার সময় আসে নাই।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

(দেশপ্রিয়ের শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষ্যে লিখিত)

যে জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় দীপ্ত জীবনদীপ বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়া সমগ্র ভারত আলোকিত করিয়াছিল, অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইতে,—তাহা মহাকালের ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন নাই—এই নিষ্ঠুর সত্য আমরা শোক বিনম্র চিত্তে বহন করিয়া অদ্য ভারত-ভাগ্য বিধাতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিব, হে ভগবন! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব আমরা, আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অগোচর, তোমার যে কল্যাণেচ্ছা,—তাহার নিগূঢ় ও অমোঘ বিধানকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া এই মহাক্ষতিকে সহ্য করিব! যে জীবন একান্তভাবে স্বদেশের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, আজ তাহা পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনের মধ্যে মহিমান্বিত—সে মহিমা তোমারই—ইহা নিশ্চিত জানিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

চট্টলের যশস্বী-জননায়ক ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারজীবী—যাত্রামোহনের পুত্র যতীন্দ্রমোহন, সাধারণ ধনীগৃহের আদরেই প্রতিপালিত হইয়াছেন। তরুণ বয়সে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত, নৈরাশ্যের সহিত, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। দুঃখসংঘাতের অভাবহীন

তাঁহার বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াছে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের ও বাঙ্গলাদেশের সৌভাগ্য যে, তিনি যাত্রামোহনের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন। সেই সংযতমনা দৃঢ়চরিত্র পুরুষের কর্ম্মজীবন যতীন্দ্রমোহনকে সাধারণ ধনীসন্তানদিগের মত গতানুগতিক অলস বিলাসে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই। পিতার নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন চরিত্রবল, স্বদেশপ্রেম এবং আত্মোন্নতি সাধনের দীক্ষা। স্বনামধন্য ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়ের কন্যা বিনোদিনী দেবী তাঁহার জননী। এই ধর্ম্মশীলা সংযতস্বভাবা নিরভিমানিনী মহিলার বিবিধ সদ্‌গুণও তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন।

অবশ্য, বাল্যকাল হইতেই তিনি সচেতনভাবে মহৎ আদর্শে জীবন গঠন করেন নাই। তৎকালীন অগ্রণী, বুদ্ধিমান যুবকগণের মতই তিনি যশঃমান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি আইন ব্যবসায়ই জীবনের উচ্চাশারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিয়াছিলেন।

তখন হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী সঙ্ঘে বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠাবান প্রধানগণের সমাবেশ। বয়সে যুবক হইলেও যতীন্দ্রমোহন তাঁহার প্রতিভা ও চরিত্রমাধুর্য্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ চৌধুরী, রাসবিহারী

ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সেদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র, হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে বসিয়া তিনি কেবল আইন ও নথিপত্রের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাঁহার পৈত্রিক সংস্কার তাঁহাকে রাজনৈতিক আলোচনায় আকর্ষণ করিত। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি, অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা উদার, দয়ালু এবং মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ প্রচুর ধনাগম খ্যাতি ও সাফল্যের গর্ব্ব দ্বারা গাম্ভীর্য্যের দুর্গ রচনা করিয়া, স্বাতন্ত্র্যের নীরস নিস্তব্ধতার মধ্যে থাকিতে পারিতেন না, হৃদয়বান বুদ্ধিমান ও স্বদেশপ্রেমিক যুবক ও নবীনগণকে তিনি তাঁহার অসামান্য হৃদয়দ্বারা আকর্ষণ করিতেন। উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া, সেকালে তাঁহার চারিদিকে যে যুবকগণ সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার সহচর ও অনুগামী হইয়াছিলেন, যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদেরই অন্যতম।

সেদিনের কথা আমাদের অনেকেরই স্পষ্টভাবে মনে আছে। মহাযুদ্ধের অবসানে, বৃটিশমন্ত্রিসভার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ, অসার দ্বৈতশাসন পদ্ধতির ঘোষণায় ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ। মডারেট নেতাগণ দেশের প্রতি কৃতঘ্ন ব্যবহার করিয়া, জাতির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, ভারতের লোকমান্য নেতা তিলক মৃত, সমগ্র দেশ চঞ্চল,—এমন সময় মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়, অহিংস অসহযোগ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার

জন্য সমগ্র ভারতকে আহ্বান। সেই মহা-আলোড়নে মথিত উদ্বেলিত বাঙ্গলা দেশের হৃদয় হইতে বাহির হইলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

যতীন্দ্রমোহনও যেন আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু আহ্বান করিবামাত্র তিনি অভ্যস্ত জীবনের গতানুগতিক ধারা একদিনেই বর্জ্জন করিলেন, আইন-ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতির দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। হাইকোর্টের বারান্দায় বিষয়-বুদ্ধি-জর্জ্জর বৃদ্ধেরা এই গুরুশিষ্যের ত্যাগকে ধিক্কার দিল, ফিরিঙ্গীয়ানায় অভ্যস্ত যুবকগণ উপহাস করিল। শীতসুপ্ত ভুজঙ্গম বসন্তরাতের বাঁশরী শুনিয়া যেমন নৃত্যচ্ছন্দে দুলিয়া উঠে, মহৎ ভাবের মহাসমারোহে প্লাবিত জাতির মধ্যে মানুষ যাহারা তেমনি জাগিয়া উঠে। জাগ্রত যতীন্দ্রমোহনকে কিছুতেই বাধা দিতে পারিল না। আরাম নয়, অর্থোপার্জ্জনের লালসা নয়, হাইকোর্টে খ্যাতিমান হইবার উচ্চাশা নয়।

অহিংস অ-সহযোগের পতাকা লইয়া দেশবন্ধুর নির্দ্দেশে দেশের কার্য্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রিয় জন্মভূমি চট্টলনগরীতে উপনীত হইলেন; সঙ্গে তদীয় গৃহিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা। এই ইংরাজ-মহিলা, বিদেশী ছাত্র যতীন্দ্রমোহনের কণ্ঠে স্বীয় জীবনের বরমাল্য দিয়াছিলেন, স্বদেশ স্ব-সমাজ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। ভারতীয় ভদ্রলোকের ইংরাজ পত্নী সম্পর্কে, সাধারণ লোকের মনে যে

একটা কুণ্ঠিত ধারণা থাকে, তাহা দূর করিয়া দিলেন শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা। এই মহীয়সী মহিলা অকুতোভয়ে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন ; স্বদেশ সেবার সমুচ্চ ব্রতে স্বামীকে উৎসাহ দিলেন। ইহা একজন বিদেশিনীর পক্ষে আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য। ভারতীয় আদর্শ পত্নীর মত পতি-অনুরাগিনী এই ইংরাজ মহিলা তাঁহার জন্মগত সংস্কার, আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর স্বজনকে স্বজন, স্বদেশকে স্বদেশ বলিয়া একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যদি সেদিন সেনগুপ্তের মনে উৎসাহ না দিতেন, দারিদ্র্য ও দুঃখকে অম্লানবদনে বরণ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমরা দেশপ্রিয়কে তেমন করিয়া পাইতাম না। আমাদের প্রিয় জননায়কের গুণকীর্ত্তন করিবার অবসরে আমরা এই পতিব্রতা দৃঢ়হৃদয়া নারীর উদ্দেশ্যেও গভীর শ্রদ্ধা বিনম্রচিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি।

চট্টলবাসী যতীন্দ্রমোহনকে বরণ করিয়া লইল। অল্প-কালের মধ্যেই তিনি চারিপার্শ্বের জনমণ্ডলীর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিলেন। তাঁহার নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া দেশবন্ধু কত আনন্দ ও গর্ব্ববোধ করিয়াছিলেন, সে কথা আজ বলিবার নহে। এই সময় চা-বাগানের কুলী ধর্ম্মঘট ও আসাম বেঙ্গল রেল ধর্ম্মঘট লইয়া যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইল, তাহার সহিত সংঘাতেই বোঝা গেল যতীন্দ্রমোহনের দৃঢ়তা। এক বিশাল অভাব পূরণের ভার

তিনি লইলেন। একদিকে প্রতিকূল সমালোচনা, অন্যদিকে রুষ্ট শাসকগণ, এ দুইএর মধ্য দিয়া সংযত শৌর্য্যে যুবক যতীন্দ্রমোহন নিজেকে একেবারে রিক্ত করিয়া দিলেন,—যাহাকে বলে একান্ত উদরান্নের অংশ, তাহাও অম্লানবদনে সমষ্টি-কল্যাণে উৎসর্গ করিলেন। দেশবন্ধুর শিষ্য যতীন্দ্র-মোহনের ধীরতা ও যোগ্যতার সেই কাহিনী বিস্মৃত হইবার নহে।

তারপর অ-সহযোগ আন্দোলন মন্দীভূত হইল। কাউন্সিলে বাধাপ্রদাননীতি লইয়া স্বরাজ্যদলের উদ্ভব হইল। এ ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধুর অনুগামী। সেই দেশব্যাপী দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেসী দ্বন্দ্বের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন একান্ত বিশ্বস্তভাবে স্বীয় গুরুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং কাউন্সিল ও করপোরেশনে সমান উৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক মধুর স্বভাব দ্বারা তিনি মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন ও প্রতিপক্ষের শ্রদ্ধা সহজেই আকর্ষণ করিতেন।

সহসা ভূমিকম্প হইল। বাঙ্গলার গর্ব্ব-গৌরবের স্বর্ণ-গিরিচূড়া, হিমগিরির কোলে ঢালিয়া পড়িল। সংগ্রামক্লান্ত দেশবন্ধু শেষ শয্যায় শয়ন করিলেন। বাঙ্গলার বহু শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী তখন কারাগারে। কংগ্রেস ও করপোরেশনের গঠন-মূলক কার্য্য কে পরিচালনা করিবে, কাহার দিকে চাহিয়া কাউন্সিলে স্বরাজ্যদল কার্য্য করিবে! দেশবন্ধুর মত শক্তিমান

কে ? এই সকল প্রশ্ন বিমর্ষ ও ব্যথিত কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। ভারতের মহিমান্বিত নেতা মহাত্মা গান্ধী তখন দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত ভবনে বিনিদ্র নয়নে শোকার্ত্ত বাঙ্গলার শিয়রে বসিয়া। দিনের পর দিন তিনি বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রান্তের ও কলিকাতা নগরীর কর্ম্মীদের মতামত শ্রবণ করিলেন, অবশেষে সেই মহাপুরুষ একদিন পরামর্শ সভায় কহিলেন, যতীন্দ্রমোহনই দেশবন্ধুর যোগ্য উত্তরাধিকারী! দুই একজন উচ্চাভিলাষী ব্যারিষ্টারের আপত্তি সত্ত্বেও, বাঙ্গলাদেশ মহাত্মাজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকেই কংগ্রেসের সভাপতি, করপোরেশনের মেয়র এবং স্বরাজ্য-দলপতিরূপে ঘোষণা করিল। এ গুরুদায়িত্ব, যশের এ কণ্টকমুকুট সাহসের সহিত সেনগুপ্ত গ্রহণ করিলেন।

নেতৃত্বের পদ কেবল যশের নহে, সম্মানের নহে। কি দুশ্চিন্তা, কি দুরূহ উদ্যম, কি ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের সহিতই না তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। পরাধীন জাতির মূঢ়তা ও ঔদাসীন্য তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে ; স্বার্থপর স্তাবকদল তাঁহার কর্ণে প্রতিনিয়ত মধুর গরল ঢালিয়াছে। প্রবল প্রতিপক্ষের নিকট হইতে প্রলোভন আসিয়াছে। সকলই তিনি ক্ষমা, সহ্য, উপেক্ষা করিয়া দিনের পর দিন প্রহরীর মত স্বদেশের মর্য্যাদাকে রক্ষা করিয়াছেন। স্বার্থ ও বিদ্বেষ, ভয় ও প্রলোভন, এ সমস্তই তিনি অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়াছেন। ঘাতসংঘাতে তাঁহার চরিত্র ও কর্ম্মকুশলতা

নিত্যমার্জ্জিত খড়্গের মত কলঙ্কহীন ঔজ্জ্বল্যে ঝলসিয়া উঠিয়াছে।

দিনে দিনে দেশকে তিনি আপন করিয়া লইয়াছেন। নিজে সমগ্রভাবে দেশকে ধরা দিয়াছিলেন বলিয়াই দেশও তাঁহাকে ধরা দিয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার দ্বারা তিনি স্বদেশসেবার ব্রতকে পবিত্র রাখিয়াছেন। সংসারে নিত্য অভাব তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। পারিবারিক কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া তিনি দেশের প্রতি কর্ত্তব্যকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই অনুদ্ঘাটিত মহত্ত্ব লইয়া আজ বাচালতা করিব না। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে অবহেলা করিবার মধ্যে যে অকম্পিত শৌর্য্য আছে, তাহার মহিমা কেবল ধ্যাননেত্রে উপলব্ধি করিব।

এই পরাধীন জাতির মধ্যে প্রতিদান প্রত্যাশার অতীত স্বদেশপ্রেম এক অপূর্ব্ব সম্পদ। ইহা অর্জ্জন করিতে হইলে যে দুঃসহ দুঃখের মূল্য দিতে হয়, যতীন্দ্রমোহন তাহা অকম্পিত বলিষ্ঠ হস্তে দিয়াছেন। বহুদিনের পরাধীনতায় যে জাতির মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া গিয়াছে, তাহার পাপ, অপরাধ, কৃতঘ্নতা, ঔদাসীন্য, হৃদয়হীন সমালোচনা ও গোলামীর গর্ব্বে উচ্ছৃত লঘুদম্ভ, এ সকলকে অতিক্রম করিয়া যে প্রেম, পঙ্ক হইতে উদ্ভুত পঙ্কজের মত, ক্লেদ কর্দ্দমের ঊর্দ্ধে আপনাকে আলোকের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়,

তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হয়, এমন পাষাণ হৃদয় কে? নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ও কলহমুখরিত রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থপ্রেমের পরিপূর্ণরূপ আমরা যতীন্দ্রমোহনে দেখিয়াছি।

স্বরাজ্যদল এবং কাউন্সিলে বাধাপ্রদান নীতির গতিবেগ ক্রমে শিথিল হইল। দেশনায়কগণ জাতীয় জীবনের সমস্যা ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধীকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া, ভারতের জীবনমরণ সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেসে ও দেশে এক আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেই যতীন্দ্রমোহন বুঝিলেন, এই সুরে তাঁহাকে সুর মিলাইতে হইবে।

বাঙ্গলার এক শ্রেণীর শক্তিমান, স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মীর আপত্তি সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন একথা বলিতে দ্বিধা করিলেন না যে, আজ মহাত্মা গান্ধীর পতাকাতলেই সমবেত হইতে হইবে। তাঁহার প্রদর্শিত পথই কল্যাণের পথ। নেতাকেও অনেক সময় স্বীয় অনুগতজনের আনুগত্য করিতে হয়; কিন্তু সত্যের মুখ চাহিয়া যতীন্দ্রমোহন তাহা করিলেন না। ফলে অনেক তেজস্বী দেশকর্ম্মীর সহিত যে তাঁহার কেবল মতভেদ হইল তাহা নহে, বিচ্ছেদ ঘটিল। ইহার কারণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া আজ আমরা কেবল ঐ বিচ্ছেদকে স্বীকার করিতে যে বল, যে সাহস, যে নিষ্ঠা, যে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, তাহাই স্মরণ করিব। তিনি কেবল বিচ্ছেদকেই স্বীকার করিলেন না পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনে স্বয়ং

অগ্রণী হইয়া কিছুমাত্র দৃকপাত না করিয়া, ঝাপাইয়া পড়িলেন। বাঙ্গলার যুবকগণ, ছাত্রগণ, দেশকর্ম্মিগণ সকলেই তাঁহার অটল আশ্রয়ে সাহস পাইলেন। বাঙ্গালী তাঁহার হস্তে সেদিন তাহার জাতীয়-পতাকা তুলিয়া দিয়াছিল, সে হস্ত আমৃত্যু অবিচলিত অকম্পিত ছিল। আমাদের মহৎ নেতা সেই দুর্য্যোগের দুর্দ্দিনে সমুন্নত শিরে একাই অগ্রসর হইলেন—কে পশ্চাতে আসিল, কে পড়িয়া রহিল, হিসাব করিলেন না। কেবল বজ্রগর্জ্জনে তাঁহার জাতিকে আহ্বান করিয়া গেলেন। সে আহ্বান লক্ষ লক্ষ হৃদয় কন্দরে ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গলার পুত্রকন্যাদিগকে ক্ষুরধার দুর্গম পথে আকর্ষণ করিল; বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে স্বাধীনতালাভের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প মূর্ত্তি ধরিয়া সহস্র সূর্য্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইল।

সে মূর্ত্তি আর দেখিলাম না। সে উদাত্ত আবেগময় কণ্ঠস্বর আর শুনিলাম না, কারাগারের অন্ধকারময় পথ দিয়া, বন্ধন শৃঙ্খলভার দূরে নিক্ষেপ করিয়া বাঙ্গলার পুরুষসিংহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

একটা জাতির উদ্বেলিত শোকসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া,—অকৃতী আমরা, তোমার সংগ্রামবহুল কর্ম্মময় জীবনের পরম প্রশান্তির সম্মুখে নতশিরে দণ্ডায়মান। তোমার স্বার্থহীন স্বদেশপ্রেমের আলোকে যেন দেখিতেছি, যাহাকে আমরা

ক্ষতি বলিয়া মনে করি, তাহা জাতীয় জীবনের দুর্লভ সম্পদ; যাহাকে আমরা ভয় বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের কাপুরুষতার বিভীষিকা মাত্র, যাহা বিপদের পথ, তাহাই কল্যাণের পথ। বাঙ্গালী জাতির যাত্রাপথে আজিকার বিঘ্ন কাল থাকিবে না; বড় বড় নামধারী মিথ্যা প্রতাপ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইবে; ক্ষমতার মোহ, অযোগ্যের স্পর্দ্ধা, ক্ষুদ্রের আস্ফালন, এ সকলই ক্ষণিকের বুদ্বুদ; কিন্তু স্বদেশের সেবায় তোমার উৎসর্গীকৃত জীবন, জাতির ইতিহাসে ধ্রুবতারার মত অক্ষয় হইয়া রহিল। আমরা তোমার মুক্ত আত্মার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।